ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অমর একুশে

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000

Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250

Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750

Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200

Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800

Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপ্স-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh Quarterly

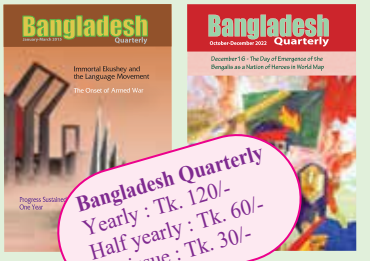

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩১

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন করেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার এ মাসে সকল ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আমাদের জাতীয় জীবনে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও অর্জনের গৌরবে চির ভাস্বর হয়ে আছে একুশ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৫২ সালে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিকসহ আরও অনেকে। তারই পথপরিক্রমায় বাংলা ভাষা পায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার পর ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের অন্যান্য সকল সদস্যদেশ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে আসছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে পুরোভাগে ছিল বীর বাঙালির তারুণ্যের প্রতীক ছাত্রছাত্রীরা। এ আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে নারী ভাষা সৈনিকদের অবদানও ছিল অবিস্মরণীয়।

ভাষার প্রতি ১৯৫২'র ছাত্রদের ভালোবাসা আর ত্যাগ ২০২৪-এর ছাত্রদেরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ দেশের বুকে ১৯৫২'র মতো অধিকার আদায়ে ২০২৪'র ত্যাগ অনুপ্রাণিত করবে আগামী আরও বহু প্রজন্মকে।

ভাষার এ মাসে আয়োজিত বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা। যে ক'টি উৎসব ও আয়োজনে বাঙালি একত্রিত হয়, তারমধ্যে অন্যতম এ বইমেলা। ভাষার জন্য ত্যাগের এ মাসকে সম্মান জানিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে আয়োজিত হয় প্রাণের এ বইমেলা।

আমরা প্রত্যাশা করছি, অমর একুশের চেতনায় আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

আশা করি, ***সচিত্র বাংলাদেশ* ফেব্রুয়ারি ২০২৫** সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে। তবেই সার্থক হবে আমাদের সকল প্রচেষ্টা।

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

অমর একুশে আজ ৬

ভাষা আন্দোলন ৮

ঢাকার প্রথম শহিদমিনার এবং পিয়ারু সরদার ১১

একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ ১৩
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

একুশে ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ১৭
জায়েদুল আলম

জাতীয় জীবনে প্রমিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা ২০
রফিকুর রশীদ

প্রাণের মেলা, জ্ঞানের মেলা, অমর একুশের গ্রন্থমেলা ২২
রহিম আব্দুর রহিম

ভাষা আন্দোলনে নারী ২৫
ড. শিল্পী ভদ্র

বাংলা ভাষার প্রসারে দরকার যুগোপযোগী পরিভাষা ২৯
ড. রুশিদান ইসলাম রহমান

জুলাই যেন একুশের বইমেলার প্রাণ ৩১
ঝর্ণা রায়

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, প্রত্যাশা ও করণীয় ৩৪
ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান

শওকত আলী : ভাষা সংগ্রামের অগ্রসেনানী ৩৭
মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ

বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে করণীয় ৩৯
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

দাপ্তরিক পত্রে ভাষাগত ত্রুটি: বিদ্যমান বাস্তবতা ও করণীয় ৪১
মো. মামুন অর রশিদ

সংস্কৃতি ও সদাচার ৪৩
পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো ৪৮
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

বই, গ্রন্থাগার ও বইমেলা ৫৩
স্বপন বিশ্বাস

বিস্ময়ে ভরা সুন্দরবন ৬০
শহিদুল ইসলাম

গল্প:

রক্তে রাঙা একুশ ৫১
পঙ্কজ শীল

ভাষা সংসার ৫৫
ইমরুল কায়েস

কবিতাগুচ্ছ: ৪৬-৪৭, ৫৮-৫৯, ৬২-৬৩

হাসান হাফিজ, আবু জাফর আবদুল্লাহ্, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, আ. শ. ম. বাবর আলী, খোরশেদ আলম নয়ন, আহসানুল হক, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, লুৎফর রহমান সাজু, শামসুল আরেফীন, শফিকুল মুহাম্মদ ইসলাম, জিহাদুল আলম, কাজল নিশি, সুশান্ত কুমার দে, ফরিদ সাইদ, রফিকুল নাজিম, আমিনুল ইসলাম সৈকত, নকুল শর্ম্মা, এম. আবু বকর সিদ্দিক, মাহমুদা দিনা, ইমরুল ইউসুফ, আলী মামুদ, মো. তাইফুর রহমান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সংগীতশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার ৬৪

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানাচ্ছি।

গত বছরের ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতির ঘাড়ে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চেপে থাকা স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে। আমাদের সাহসী তরুণদের এই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এই বিজয়ের মাধ্যমে এসেছে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার ইস্পাত কঠোর প্রতিজ্ঞা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থিত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে স্মরণ করছি জুলাইয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল দুঃসাহসী ছাত্র-জনতা-শ্রমিক প্রাণ দিয়েছেন এবং নির্মমভাবে আহত হয়েছেন তাদের সকলকে।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত অভ্যুত্থান এবারের বইমেলা নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য– 'জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান এবং তার মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের বিনির্মাণ'।

বরাবরই একুশে মানে জেগে উঠা। একুশে মানে আত্মপরিচয়ের সাথে মুখোমুখি হওয়া। একুশে মানে অবিরাম সংগ্রাম। নিজের পরিধিকে আরও অনেক বাড়িয়ে নেওয়া। এবারের একুশের প্রেক্ষিত আমাদেরকে নতুন দিগন্তে প্রতিস্থাপন করেছে।

বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের বুকের রক্তে যে অঙ্গীকার মাখা ছিল তাতে ছিল জুলাই অভ্যুত্থানকে নিশ্চিত করার মহা বিস্ফোরক শক্তি। অর্ধ শতাব্দী পর এই মহা বিস্ফোরণ গণ-অভ্যুত্থান হয়ে দেশ পাল্টে দিলো। এই বিস্ফোরণ আমাদের মধ্যে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় গ্রোথিত করে দিয়ে গেল। ১৭ কোটি মানুষের প্রতিজনের সত্তায় এই প্রত্যয় গভীরভাবে গ্রোথিত। অমর একুশের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই প্রত্যয়ে শপথ নিতে এসেছি।

একুশ আমাদের মূল সত্তার পরিচয়। একুশ আমাদের ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছোটো-বড়ো, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, ক্ষণস্থায়ী-দীর্ঘস্থায়ী সকল দূরত্বের ঊর্ধ্বে। এজন্য সকল প্রকার জাতীয় উৎসবে, সংকটে, দুর্যোগে আমরা শহিদমিনারে ছুটে যাই। সেখানে আমরা স্বস্তি পাই। শান্তি পাই। সমাধান পাই। সাময়িকভাবে অদৃশ্য ঐক্যকে আবার খুঁজে পাই। একুশ আমাদের

মানসকে এভাবে তৈরি করে দিয়েছে। একুশ আমাদের পথ দেখায়। একুশ আমাদের জাগিয়ে তোলে। মাত্র ছয় মাস আগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাতিকে এক ঐতিহাসিক গভীরতায় ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। যার কারণে আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবিক দিক থেকে বিধ্বস্ত এক দেশকে দ্রুততম গতিতে আবার উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তৈরি করার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহস খুঁজে পেয়েছি।

একুশের টান বয়সের ঊর্ধ্বে। প্রজন্মের ঊর্ধ্বে। একুশের টান প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিস্তৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই টান গভীরতর হয়েছে। আমাদেরকে দুঃসাহসী করেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। দুঃস্বপ্নের বাংলাদেশকে ছাত্র-জনতা নতুন বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। আমাদের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে তাদের স্বপ্নগুলো, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো, তাদের দাবিগুলো অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় এঁকে দিয়েছে। আমাদের রাস্তার দেয়াল এখন ঐতিহাসিক দলিলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এগুলোর স্থান এখন আমাদের বুকের মধ্যে এবং জাদুঘরে হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন শেষে বইয়ের স্টল ঘুরে দেখেন– পিআইডি

আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বইমেলার উদ্যোক্তাদের, তারা এই দেয়ালচিত্রগুলো মেলায় আসা এবং যাওয়ার পথে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এর গুণগত ও আয়োজনগত বিবর্তন হতেই থাকবে। বইমেলায় হাজির করার জন্য লেখক-লেখিকারা সারাবছর প্রস্তুতি নিতে থাকেন যথাসময়ে নিজ নিজ বই সমাপ্ত করার জন্য। প্রকাশকরা অনেক আয়োজন করেন নিজেদের বইগুলো যথাসময়ে হাজির করার জন্য, গুণগত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য এবং আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রতিবছর বিষয়ভিত্তিক 'সেরা লেখক' স্বীকৃতির আয়োজন করলে লেখকরা এই স্বীকৃতি পাবার জন্য এবং সেরা লেখকরা সেরা প্রকাশক পাবার জন্য অনেক সহায়ক হবে। আমি এই প্রস্তাব দিচ্ছি।

আমরা যদি একুশের ভাষা আন্দোলনকে আরও গভীরতর প্রেক্ষিতে স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবেও দেখি তাহলে অমর একুশের গণ্ডি বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমরা ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের তাদের সৃজনশীলতার জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি, নতুন উদ্যোক্তা হবার জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি। শহর ও গ্রামের নারী-পুরুষকে কৃষি, শিল্প, সাংস্কৃতিক জগৎ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য শিক্ষায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা নির্দিষ্ট বছরে জাতির জন্য অবদান রেখেছেন তাদের স্বীকৃতি দিতে পারি, তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে দিতে পারি।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের, প্রবাসী শ্রমিকদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি দিতে পারি। সারা পৃথিবীজুড়ে নানা কাজে বাংলাদেশিরা কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আমরা একুশের দিনে তাদের সবাইকে স্মরণ করতে চাই। তারা সবাই একুশের দিনে নিজের দেশকে স্মরণ করে অনুষ্ঠান করে। তারা আমাদের পরিবারের অংশ হিসেবে তাদের সন্তান-সন্ততির কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়।

আমার সব কথা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এমন চিন্তা করছি না। তবে নিজের বলার সুযোগ যখন পেয়েছি তখন বলে রাখলাম।

বাংলা একাডেমিকে ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এর সঙ্গে একুশে বইমেলা ২০২৫-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।
মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

অমর একুশে আজ

'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে-পায়'। পাকিস্তানের জান্তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা। লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-গর্বের শ্রেষ্ঠ স্থানটি। কিন্তু বাংলার দামাল ছেলেরা তা হতে দেয়নি। বুকের রক্ত দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেছে মাতৃভাষার সম্মান। ১৯৫২ সালের এই দিনে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল মাতৃভাষা বাংলার অধিকার। আজ রক্তাক্ত সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে গভীর শোক ও বেদনার দিন; একই সঙ্গে গৌরবেরও। আজ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৭৩ বছর পূর্ণ হলো। একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছোঁয়ার আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীর সারি দেখা যায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে।

১২টা ১ মিনিটে শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এরপর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় একুশের প্রথম প্রহর। একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার শ্রদ্ধা জানানোর পর কেন্দ্রীয় শহিদমিনার এলাকায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন রফিক, সালাম, বরকত, শফিউর, জব্বাররা। তাঁদের রক্তে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল দুখিনি বাংলা বর্ণমালা, মায়ের ভাষা। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের যে সংগ্রামের সূচনা সেদিন ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ বেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাঙালির কাছে চিরপ্রেরণার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে বাঙালি জাতি যে ইতিহাস রচনা করেছিল, শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্ব তাকে বরণ করেছে সুগভীর শ্রদ্ধায়। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ'। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদদের উৎসর্গ করে এ বছর অমর একুশে বইমেলার এ থিম নির্ধারণ করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার এ অভ্যুত্থানে ছাত্রদের আত্মত্যাগের চেতনা বইমেলার সর্বত্র প্রতিফলিত হবে।

সকাল থেকে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার অভিমুখে মানুষের ঢল নামে। হাতে ফুল, হৃদয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর কণ্ঠে– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' অমর একুশের এ গান তুলে মানুষের সম্মিলিত স্রোত মেশে এক পথে। শহিদমিনারে পুষ্পার্ঘ্য শেষে অনেকেই যান আজিমপুর কবরস্থানে শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করতে। আজ সরকারি ছুটির দিন। দেশের সর্বত্র অর্ধনমিত রাখা হয়েছে জাতীয় পতাকা। টেলিভিশন ও বেতারে ভাষা দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হচ্ছে। জাতীয় দৈনিকগুলোয় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থান বর্ণমালা সংবলিত ফেস্টুন দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তাদের ৩০তম সম্মেলনে ২৮ দেশের সমর্থনে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮ দেশে একযোগে দিবসটি পালিত হচ্ছে। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সারাদেশেই আজ থাকছে নানা আনুষ্ঠানিকতা।

[সূত্র: একুশে টেলিভিশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫]

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে —এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং ভাষার ব্যাপারে তারা একটি চূড়ান্ত দাবিনামা প্রস্তুত করেন। দাবিটি হলো: পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ও সরকারি কার্যাদি পরিচালনার মাধ্যম হবে বাংলা আর কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি— বাংলা ও উর্দু।

ভাষাসংক্রান্ত এই দাবিকে সামনে রেখে সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত করে তমদ্দুন মজলিস। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং একসময় তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফোরামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে। সভার পরও মিছিল-প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। এ মাসেরই শেষদিকে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। পরের বছর ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবে সংশোধনী এনে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লাখই পূর্ব পাকিস্তানের, যাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বিরোধিতা করলে এ দাবি বাতিল হয়ে যায়। এ খবর ঢাকায় পৌঁছলে ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা বিক্ষুব্ধ হন। *আজাদ*-এর মতো পত্রিকাও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনা প্রস্তাবে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সমালোচনা করে। পরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি নতুন রাষ্ট্রভাষা পরিষদ গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল আলম।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ একটি স্মরণীয় দিন। গণপরিষদের ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ ঐদিন ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটিদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’— এই স্লোগানসহ মিছিল করার সময় শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, আবদুল ওয়াহেদ প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। আবদুল মতিন, আবদুল মালেক উকিল প্রমুখ ছাত্রনেতাও উক্ত মিছিলে অংশ নেন; বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়। একজন পুলিশের নিকট থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা

করলে পুলিশের আঘাতে মোহাম্মদ তোয়াহা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ১২-১৫ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়।

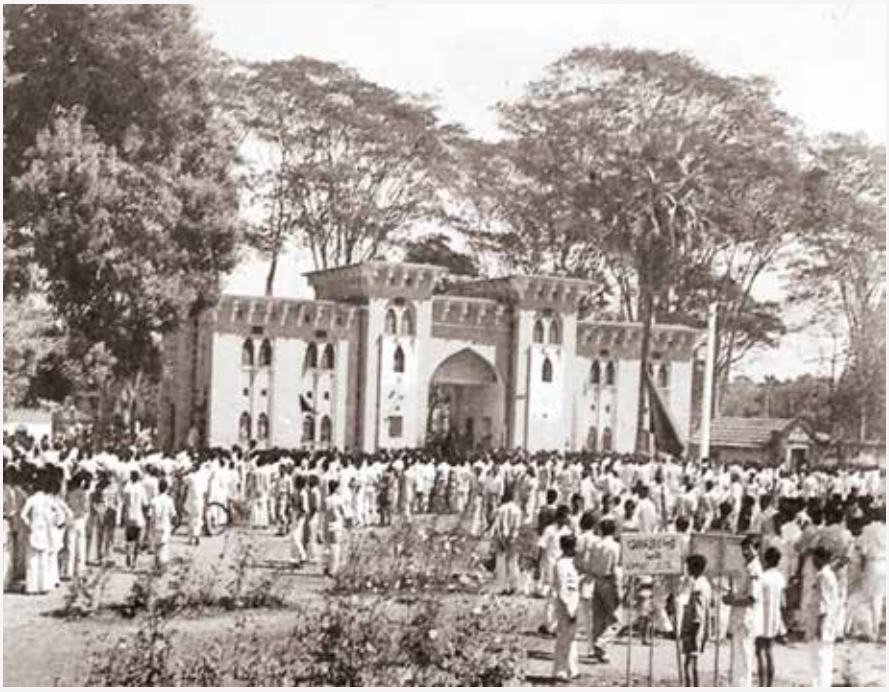

আন্দোলনের মুখে সরকারের মনোভাব কিছুটা নমনীয় হয়। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে চুক্তিতে তিনি অনেকগুলো শর্তের সঙ্গে একমত হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তাকে কোনো কিছুই মানানো যায়নি।

১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকার দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দুই জায়গাতেই বাংলা ভাষার দাবিকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্য তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়; এর আহ্বায়ক ছিলেন আবদুল মতিন।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে থাকে। এ সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়েই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা ও শোষণের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং এখানকার জনগণ ক্রমেই এই মতে বিশ্বাসী হতে শুরু করে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় তাদের ওপরে আরোপিত হয়েছে নতুন ধরনের আরেক উপনিবেশবাদ। এ প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বলেন যে, প্রদেশের সরকারি কাজকর্মে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে কেবল উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় এবং 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করেন। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সময় সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করে। এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এসব কর্মসূচির আয়োজন চলার সময় সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের (১৯০৫-১৯৭৪) সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। ১৪৪ ধারা অমান্য করা হবে কি না— এ প্রশ্নে সভায় দ্বিমত দেখা দেয় তবে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার সংকল্পে অটুট থাকে।

পরদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে আবদুল মতিন এবং গাজীউল হক নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'

স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে, ছাত্রীরাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ শ্রেণির ছাত্র) নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যায়।

এ সময় গণপরিষদের অধিবেশন বসার প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলি চালানোর খবর পেয়ে গণপরিষদ সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ এবং বিরোধী দলের সদস্যসহ আরও কয়েকজন সভাকক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে দাঁড়ান। অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষার দাবির বিরোধিতা অব্যাহত রেখে বক্তব্য দেন। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি ছিল গণবিক্ষোভ ও পুলিশি নির্যাতনের দিন। জনতা নিহতদের গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ে ও শোকমিছিল বের করে। মিছিলের উপর পুলিশ ও মিলিটারি পুনরায় লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চালায়। এতে শফিউর রহমানসহ কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা যে স্থানে গুলির আঘাতে নিহত হয় সেখানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী নির্মাণের জায়গায় একটি কংক্রিটের স্থাপনা নির্মিত হয়।

গণপরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিয়ে একটি বিল পাস করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অনুমোদনের মাধ্যমে এই আন্দোলন তার লক্ষ্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) এক পর্যায়ে এর সদস্য ফরিদপুরের আদেলউদ্দিন আহমদের (১৯১৩-১৯৮১) দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৫২ সালের পর থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাঙালিদের সেই আত্মত্যাগকে স্মরণ করে দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। [বশীর আল হেলাল]

গ্রন্থপঞ্জি: আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫; আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদি পর্ব*, ঢাকা, ১৯৭৬; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৯।

[সূত্র: বাংলাপিডিয়া]

ঢাকার প্রথম শহিদমিনার এবং পিয়ারু সরদার

অশ্রুমেশা আমাদের সেই প্রথম শহিদমিনার
যদিও আজ দাঁড়িয়ে নেই আর,
বর্তমানের মিনারেই তো রয়েছে স্মৃতি তার
আর স্মৃতিতে আজও আছেন পিয়ারু সরদার!

'পিয়ারু সরদার স্মরণে' অমর চরণটি লিখেছিলেন সব্যসাচী সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। ভাষা আন্দোলন ও ঢাকায় একুশের প্রথম শহিদমিনার নির্মাণের পেছনে এক অনন্য কারিগর ছিলেন পুরান ঢাকার প্রভাবশালী সরদার, পিয়ারু সরদার।

২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা শহিদমিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তাদের জন্য সেদিন পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। কারফিউ ও সেনাবাহিনীর টহলের মাঝে নির্মাণসামগ্রী জোগাড় করা রীতিমতো অসম্ভব। ঢাকা মেডিকেলের তখন সম্প্রসারণের কাজ চলছিল। নির্মাণসামগ্রী সব আছে। কিন্তু সিমেন্ট ছিল পাশেই তালাবদ্ধ গুদামে। 'তালার চাবি নিশ্চয়ই ঠিকাদারের কাছেই পাওয়া যাবে' বললেন ছাত্রদের কেউ কেউ। কিন্তু ঠিকাদারকে পাওয়া যাবে কোথায়!

মেডিকেল ছাত্র আলী আসগর বললেন, তিনি চেনেন ঠিকাদারকে। ঠিকাদার এই মহল্লারও সরদার। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তখন, অন্যদিকে কারফিউ। সেই কারফিউয়ের মধ্যেই কয়েকজন গেলেন সরদারের বাড়ি।

ঠিকাদারের কাছে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছা জানালেন তারা। সেই ঠিকাদারই ছিলেন পিয়ারু সরদার।

সবকিছু জেনে তিনি ছাত্রদের বললেন ,'লিয়া যাও চাবি, যেমনে যা লাগে যা মুঞ্চায় মাল ছামান নিয়া কামে নাইমমা পড়। খালি হক্কালে মঙে কইরা চাবিখান দিয়া গেলেই অইবো।' তখনও কিন্তু ছাত্ররা জানেন না, ২১ তারিখে টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচতে তারা যে ড্রামগুলোর পানি চোখেমুখে দিয়েছিলেন, সেই ড্রামগুলো রাখা হয়েছিল পিয়ারু সরদারের নির্দেশেই।

পিয়ারু সরদার চাবি বের করে তুলে দিলেন মেডিকেলের ছাত্র আসগরের হাতে। বললেন, 'শুধু মাল দিয়ে ক্যামতে কী? মিস্ত্রিও ভি লাগব।' ২ জন মিস্ত্রিকে ডেকে নিজেই বললেন, তারা যেন ছাত্রদের কাজে সহযোগিতা করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যেই গড়া হয় ঢাকায় একুশের প্রথম শহিদমিনার। শহিদমিনারের কাজ শেষ হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভোরে। সকালে শহিদমিনারের অনানুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউরের বাবা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি *আজাদের সম্পাদক* আবুল কালাম শামসুদ্দিনের হাতে।

শহিদমিনার নির্মাণে এত সহযোগিতা করে পিয়ারু সরদার কতটা সাহসিকতা দেখালেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি তখন প্রাদেশিক সরকারের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার। সহযোগিতার বিষয়টি জানাজানি হলে তার পাওনা বিল আটকে যেত, বাতিল

হতে পারত ঠিকাদারির লাইসেন্সও। সঙ্গে জুটত ঠিকাদার হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত হওয়া। এত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছাত্র আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহিদমিনার ভেঙে ফেলে। পিয়ারু সরদার ও তার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় প্রাদেশিক সরকারের অর্থায়নে নির্মিত প্রথম আনুষ্ঠানিক শহিদমিনার নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল। কিন্তু পরে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে কামানের গোলার আঘাতে সেই শহিদমিনারও ভেঙে ফেলে পাকিস্তানি হানাদাররা।

কেবল ঢাকায় একুশের প্রথম শহিদমিনারের সঙ্গেই যে পিয়ারু সরদারের সংশ্লিষ্টতা ছিল, তা কিন্তু না। ভাষা আন্দোলনের পরও মিছিল চলাকালীন ছাত্ররা পুলিশের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষে জড়িয়ে

পড়তেন। পুলিশের তাড়া খেয়ে তখন ছাত্ররা পিয়ারু সরদারের মহল্লায় এসে আশ্রয় নিতেন। পিয়ারু সরদার তার মহল্লায় তল্লাশি থেকে পুলিশকে সরিয়ে রাখতেন, নিজেই সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন। পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির জন্যও পিয়ারু সরদার ছিলেন এক অনন্য আশ্রয়। রণেশ দাশগুপ্ত, কমরেড ফরহাদ, মণি সিংহরা তার অবদানের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। আইয়ুব খান, মোনায়েম খানের আমলে এনএসএফের কর্মীরাও তার এলাকায় ঢুকে কিছু করার সাহস পেত না।

পিয়ারু সরদার ছিলেন ঢাকার বেশ কয়েকটি এলাকার সরদার। পুরান ঢাকার হোসেনি দালান, উর্দু রোড থেকে নাজিমউদ্দিন রোড, বকশিবাজার, আজিমপুর, পলাশী মহল্লার সরদার ছিলেন তিনি। তার তত্ত্বাবধানে ও দানে গড়ে উঠেছিল পুরান ঢাকার বেশ কয়েকটি এতিমখানা, মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের অফিসও ছিল তার মহল্লায়।

ব্রিটিশ আমলে ঠিকাদারি শুরু করলেও পিয়ারু সরদারের ঠিকাদারির নাম ছড়িয়েছিল পাকিস্তান আমলে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে রমনা পার্ক, রানি এলিজাবেথের মঞ্চ তৈরি, ভিক্টোরিয়া পার্কের নানা কাজ, আদমজী জুটমিল, আসাদ গেট, ঢাকা মেডিকেলের নার্সিং হোস্টেল নির্মাণ পিয়ারু সরদারের ঠিকাদারিতেই হয়েছিল। রানি এলিজাবেথের আগমন উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তৎকালীন লাট ভবন (বর্তমানের বঙ্গভবন) পর্যন্ত দ্রুততম সময়ে নতুন রাস্তা নির্মাণেও পিয়ারু সরদারের ছিল অনন্য ভূমিকা।

পিয়ারু সরদারের জন্ম ১৮৯৩ সালে। তার বাবা মুন্নু সরদারও ছিলেন ঢাকার নামকরা সরদার। পিয়ারু সরদারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ১৯৪৪ সালে, ৫১ বছর বয়সে। এরপর টানা ১৭ বছর তিনি সরদার ছিলেন, ষাটের দশকে হয়েছিলেন কমিশনারও। পিয়ারু সরদার মারা যান ১৯৬১ সালের ৫ই অক্টোবর। তার বংশধরদের মালিকানাধীন পিয়ারু সরদার অ্যান্ড সন্স ডেকোরেটর আজও জাতীয় ঈদগাহে নামাজের ব্যবস্থাপনা ও প্যান্ডেল নির্মাণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ঐ সময় ঢাকার সরদারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন জুম্মন সরদার, মাজেদ সরদার, মওলা বক্স সরদার, মোতি সরদার, মির্জা কাদের সরদার আর পিয়ারু সরদার। কিন্তু ভাষা আন্দোলন আর ঢাকায় প্রথম শহিদমিনার নির্মাণে অসামান্য ভূমিকা পিয়ারু সরদারকে রাখবে এক অনন্য উচ্চতায়।

[তথ্যসূত্র: প্রথম শহিদমিনার ও পিয়ারু সরদার, সম্পাদক ড. আনিসুজ্জামান]

একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

মহান একুশকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তায় যে চেতনার জন্ম হয়েছিল, তা ছিল এক অবিনাশী চেতনা। ২০২৪ সালের ছাত্রদের কোটাবিরোধী আন্দোলনের ন্যায় সূচনায় ছাত্র আন্দোলন হিসেবে এর প্রকাশ ঘটলেও দ্রুতই তা দেশজুড়ে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয় সর্বশ্রেণির মানুষের সমর্থন নিয়ে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি হচ্ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুসংহত হয় এবং প্রভূত অগ্রগতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই জনগণের মধ্যে পরবর্তীকালে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক নতুন প্রেরণার উন্মেষ ঘটায় এবং এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালি জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে হাজার গুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন।

একুশের আন্দোলন যদিও একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল, কিন্তু তা কেবল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও। বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম সফল সংগ্রাম হিসেবে পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই একুশের চেতনা বাঙালি জনমনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে।

একুশের চেতনার জন্ম হয়েছিল এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল, তা পরবর্তী আন্দোলনগুলোর জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় একুশের চেতনায় বাঙালি সাধারণের আত্মজাগরণ ঘটেছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির হৃদয়বিদারক ঘটনার পর থেকে বাংলার জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল মিষ্টি-মধুর কথায় অধিকার আদায় হয় না; এর জন্য রক্ত ঝরাতে হয়। পরবর্তীকালে এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ বাংলার জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল; যার পেছনে অনুঘটক হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে সেদিন জেনেশুনেই মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। শাসকের রক্তচক্ষু, ভয়ভীতি কোনো কিছুই তাদের পিছু হটাতে পারেনি। সেই একুশের শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে ইতোঃপূর্বে আমরা আমাদের দেশের কল্যাণার্থে ধাপে ধাপে অনেকগুলো লড়াই-সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছি। সবশেষে ২০২৪ সালে এসে জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে জেন-জি প্রজন্ম ফ্যাসিবাদের ক্রীড়নকদের বিতাড়িত করেছে। দেশ মুক্ত হয়েছে জুলুমবাজদের হাত থেকে। আর আমরা পেয়েছি নতুন স্বাধীনতা, নতুন এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ।

ব্রিটিশ বেনিয়ারা অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থায় মুসলমানদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে এ উপমহাদেশে প্রায় ২০০ বছর শাসনের নামে শোষণ করে। ১৯৪৭ সালে অবসান হয় সে শোষণের। ভাষা এবং সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ভাষার একটি বিস্তৃত অংশ বাংলা ভাষার অন্তর্গত। বাংলা ভাষা এ দেশের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে লালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান আর ১৫ই আগস্ট জন্ম নেয় ভারত। দেশভাগের আগেই ভারত হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। পাকিস্তান নানা প্রতিকূলতার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বা অর্ধেকের বেশি জনগণের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দুভাষীরা বাঙালিদের তুলনায় সংখ্যালঘু তথা তৎকালীন নিখিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ। অবশ্য শাসকরা প্রধানত উর্দুভাষী আর প্রশাসনের উচ্চপদস্থরাও উর্দুভাষী। এই দ্বিমুখী ক্ষমতার খেয়ালিপনায় নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গকে অমীমাংসিত রেখেই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ভুল চেষ্টা শুরু করা হয়। কোনোরকম নীতি নির্ধারণ না করেই তারা এখানে টাকা, মনিঅর্ডার ফরম, ডাকটিকিট, রেল-লঞ্চ-স্টিমারের টিকিট ইত্যাদিতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু আর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে থাকে। সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীর কাছে যাচ্ছে সংখ্যালঘুর উর্দু, বাংলা যেখানে অনুপস্থিত। বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই ভুল শোধরাতে বহু বাঙালি ব্যক্তিত্ব বহুভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু সোজা কথায় তারা কর্ণপাত করলেন না।

দরকার পড়ল মা ও মাটির টানে মুখর এক গণ-জাগরণের। আর গণ-জাগরণের জন্য চাই গণ-আন্দোলন। সেই গণ-আন্দোলনের সূচনা, বিকাশ, পরিণতি এবং সাফল্যের এই চারটি পর্বেই যাঁরা সবিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন– তমদ্দুন মজলিসের সভাপতি প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক ড. এ এস এম নূরুল হক ভূঁইয়া, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক শাহেদ আলী, বদরুদ্দীন ওমর, শামসুল আলম, কাজী গোলাম মাহবুব, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, গাজীউল হক, আবদুল মতিন, আহমদ রফিক, অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রিন্সিপাল আশরাফ ফারুকী প্রমুখ।

একুশের চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনের আত্মত্যাগের বীজমন্ত্র। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষের প্রথম সংগঠিত সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিটি গণ-আন্দোলনের প্রেরণাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ঐ আন্দোলন। সেদিন বাঙালির আত্মচেতনার যে উদ্বোধন ঘটেছিল তা-ই নানা আন্দোলন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে। একুশের চেতনা পরিণতি লাভ করেছিল স্বাধীনতার চেতনায়।

একুশের চেতনায় কেবল যে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, বাঙালির জাতীয় চেতনাকেও একুশ স্ফটিক-স্বচ্ছতা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের ওপর যে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন চালায় তার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় সংগঠিত হতে একুশ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আর আমাদের সচেতন ও সক্রিয় হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সাম্য, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে।

পৃথিবী সৃষ্টিলগ্ন থেকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানব সম্প্রদায়ের মাঝে হাজারও ভাষা প্রচলিত রয়েছে। যেখানে বা যে দেশে মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষা বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে সে দেশের মাতৃভাষা বলা হয়। মানুষের অস্তিত্বের আর এক অপরিহার্য ভিত্তি তার মাতৃভাষা। এ মাতৃভাষা কারও কোনো দান বা অনুদানের বিষয় নয়। এই ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার শৈশব থেকে ভাববিনিময় করতে শেখে। এই ভাষার মাধ্যমেই মাতৃভাষাভাষী সমাজ-পরিমণ্ডলে মানুষ জ্ঞান, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করে। আবার এই ভাষার মাধ্যমেই সে তার নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষের জীবনে ভাষা তথা মাতৃভাষার অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমরা কম-বেশি সবাই অবগত আছি যে, মাতৃভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা যত সহজ, অন্য ভাষায় সেটা তত সহজ নয়। মাতৃভাষা সহজাত আপন ভাষা, অন্য ভাষা পরের ভাষা। বিদেশি ভাষা শেখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মাতৃভাষায় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত বিশ্বে কোনো জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারেনি। ইংরেজরা যেদিন ফরাসি ভাষাকে মাতৃভাষার ওপর স্থান দিয়েছিল তখন সে দেশের সাহিত্যের স্ফুরণ হয়নি। স্ফুরণ হয়েছিল সেদিন, যেদিন তারা মাতৃভাষায় পবিত্র *বাইবেলের* অনুবাদ করে দেশের মানুষের *বাইবেল* ও মাতৃভাষা উভয়কেই অসীম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করলেন। রাশিয়াও মাতৃভাষাকে স্বীকার করেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের গৌরবময় অগ্রগতির পথে বিশিষ্ট মর্যাদায় চিহ্নিত হয়েছে। প্রাচ্যের জাপানও একদিন পাশ্চাত্যের শিক্ষাধারাকে গ্রহণ করেছিল; সেদিন তার অগ্রগতি ছিল কুণ্ঠিত। তারপর মাতৃভাষার মাধ্যমেই তারা গৌরবময় অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে।

মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সৃষ্টিশক্তি ও কল্পনাশক্তির যথার্থ বিকাশ সম্ভব। তাই শিক্ষা যেখানে মানুষের সহজাত অধিকার, সভ্যতার ক্রমবিকাশের অনিবার্য অঙ্গীকার, সেখানে কৃত্রিমতার কোনো অবকাশ নেই। কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করতে হলে, গভীর করতে হলে, ব্যাপক করতে হলে তাকে চির পরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করে দিতে হয়। নানা কারণে অন্য যে-কোনো ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তাই বাংলার দামাল ছেলেরা সেদিন তথা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশমাতৃকার চেতনাকে ধারণ করে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে যেয়ে।

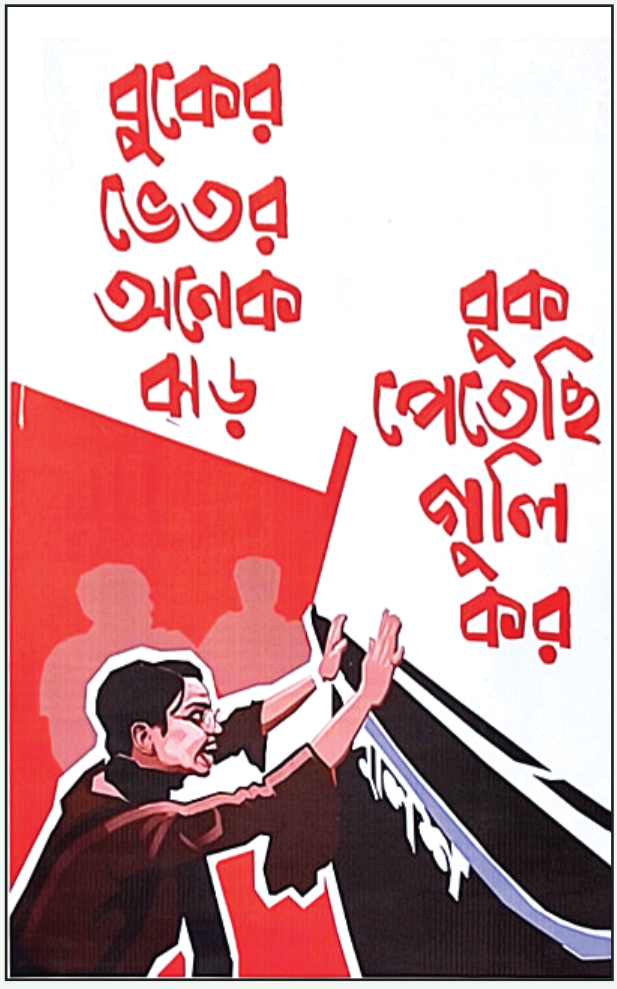

তাই জুলাই বিপ্লবোত্তর আজকের পরিবর্তিত নতুন বাংলাদেশে একুশের সঠিক ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। আজকের প্রজন্মকে আরও বেশি বেশি একুশের চেতনায় ও ভাষা আন্দোলনের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের রয়েছে ভাষা আন্দোলনের মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবগাথা, যা পৃথিবীর আর কোনো জাতির নেই।

এখন বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করছে বিশ্ববাসীও, যা একুশের ইতিহাসকে যেমন গৌরবময় করে তুলেছে তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে তার নিজস্ব মহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে। একুশ বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের প্রথম ভিত। কাজেই একুশের চেতনাকে আমাদের জাতীয় জীবনে ধরে রাখতে হবে। জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।

একুশের চেতনা শুধু ভাষার জন্য সংগ্রামের চেতনা নয়; এটি আত্মপরিচয়, স্বাধীনতা আর ন্যায়বিচারের চেতনা। একুশ আমাদের শেখায় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। একুশ আমাদের শেখায় যে, আমাদের ভাষা আমাদের অস্তিত্বের প্রমাণ, আমাদের সংস্কৃতির বাহক, আমাদের ঐতিহ্যের ধারক। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা আমাদের চিন্তাভাবনা, আমাদের সৃজনশীলতার উৎস। এককথায় ভাষা একটি জাতির আত্মা, একটি জাতির পরিচয়।

একুশের চেতনা শুধু আমাদের অতীত স্মৃতিই মনে করিয়ে দেয় না, এটি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথের দিশা। একুশের চেতনা আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার, যেখানে সকল নাগরিক তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবে, শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে ও নিজেদের সংস্কৃতি আগলে রাখতে পারবে।

আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ আবিষ্কারেও একুশের অবদান অসামান্য। কারণ একুশের বদৌলতে আমরা জেনেছি আমরা বাংলার সন্তান। জেনেছি বাংলা ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা বাষট্টি, উনসত্তর ও একাত্তরে আমাদের আত্মপরিচয়, আমাদের ঠিকানা ও দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে লড়াই করেছি। একুশের পথ ধরেই এসেছে আমাদের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ একুশের চেতনারই ফসল।

আসুন, ১৯৫২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ ও সবশেষে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শোষণ ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যারা তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা সবাই মিলে একুশের চেতনাকে বুকে ধারণ করি। আমরা বাংলা ভাষাকে লালন করি, সমৃদ্ধ করি। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এর প্রচার-প্রসারে মিলেমিশে কাজ করি। এই চেতনা অম্লান রেখে সকল হিংসা-হানাহানি ভুলে জাতির সব ধরনের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য আমরা অক্লান্তকর্মী হই; আর তাতেই পূরণ হবে ভাষা শহিদদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, dr.alim1978@gmail.com

একুশে ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

জায়েদুল আলম

একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের একাধারে মর্মান্তিক ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ই ফাল্গুন ১৩৫৯) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহিদ হন। তাই এ দিন শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পটভূমি

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইংরেজিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় বাংলাকে অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে ধীরেন্দ্রনাথ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি তোলেন। এছাড়াও সরকারি কাগজে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান তিনি। গণপরিষদের ঘটনার প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু হয় ঢাকায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখেও ধর্মঘট ঘোষিত হয় এবং ঐদিন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ দিবস ও ধর্মঘট পালন করা হয়। সরকারের প্ররোচনায় পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে এবং অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তমদ্দুন মজলিস ঐসময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশ ঘটে। ঐ সভায় দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং শামসুল আলম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ পরিষদে অন্যান্য সংগঠনের দুইজন করে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে ছাত্ররা ১১ই মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তার সাহসী ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

১৯শে মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে পৌঁছান পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও স্থপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ভারত বিভাগের পর এটাই ছিল তার প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর। ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ও সেখানে তিনি ভাষণ দেন। তার ভাষণে তিনি ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও তিনি বলেন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা নির্ধারিত হবে প্রদেশের অধিবাসীদের ভাষা অনুযায়ী; কিন্তু দ্ব্যর্থহীন চিত্তে ঘোষণা করেন – 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়'। জিন্নাহর এ বিরূপ মন্তব্যে তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উপস্থিত ছাত্র-জনতা। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই ধরনের বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তার অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে না, না বলে চিৎকার করে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের মতো আবেগিক বিষয়ের পুনরায় জোরালো হবার পেছনে ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীনের ভাষণ প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন খাজা নাজিমুদ্দীন ২৫শে জানুয়ারি ঢাকায় আসেন এবং ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি মূলত জিন্নাহর কথারই পুনরুক্তি করে বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচারিত তার ভাষণে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে-কোনো জাতি দুটি রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদসভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদসভা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে তারা তাদের মিছিল নিয়ে বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমি) দিকে অগ্রসর হয়। পরদিন ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। সভায় আরবি লিপিতে বাংলা লেখার সরকারি প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং ৩০শে জানুয়ারির সভায় গৃহীত ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেওয়া হয়। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। সমাবেশ থেকে আরবি লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রতিবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ছাত্ররা তাদের সমাবেশ শেষে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

২০শে ফেব্রুয়ারি সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন হলে সভা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪ নবাবপুর রোডস্থ আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যালয়ে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কিছু সদস্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার পক্ষে ভোট দেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে ফজলুল হক হলের পুকুরপাড়ে ছাত্রনেতাদের বৈঠকে পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে এবং পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামতকে বিবেচনা করার আহ্বান জানাতে থাকে। বটতলায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তাব দেন। সহস্র কণ্ঠ গর্জে উঠল ১৪৪ ধারা মানবো না, মানবো না। সিদ্ধান্ত মতে ১০ জন, ১০ জন করে ছাত্র মিছিল করে অ্যাসেম্বলি ভবনের দিকে যেতে থাকে। পুলিশ ছাত্রদের প্রথম দলটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে স্লোগান দিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেট থেকে বের হতেই পুলিশবাহিনী তাড়া করে, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এমএলএ ও মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদ ভবনে আসতে থাকেন। পুলিশ বেপরোয়াভাবে এ সময় ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। বাধ্য হয়ে ছাত্ররা ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য

করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার শহিদ হন এবং আরও ১৭ জন গুরুতর আহত হন। রাতে আবুল বরকত মারা যান। গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকাসহ সারাদেশের পরিস্থিতি পালটে যায়। ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকানপাট ও পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। রেডিও শিল্পীরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে শিল্পী ধর্মঘট আহ্বান করে এবং রেডিও স্টেশন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে সারাদেশ হয়ে উঠে মিছিল ও বিক্ষোভে উত্তাল। জনগণ ১৪৪ ধারা অমান্য করার পাশাপাশি শোক পালন করতে থাকে। বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মস্থল ত্যাগ করে ছাত্রদের মিছিলে যোগ দেয়। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক সকলে ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়। লাখো মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবি জানাজা। শহরে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। হাইকোর্টের সামনে পুনরায় গুলিবর্ষণ হলে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। ঐ দিন বংশাল রোডে সরকার সমর্থিত *দৈনিক সংবাদ* অফিসে জনতা হামলা চালায়। সেখানে পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম নিহত হন। একই দিনে পুলিশ দ্বারা আক্রমণ ও হত্যার বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। নওয়াবপুর রোডে মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে শহিদ হন ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি

১৯৫৪ সালের ৭ই মে মুসলিম লীগের সমর্থনে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লিখিত হয়। সংবিধানের ২১৪(১) অধ্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে লেখা হয়:

২১৪. (১) The state language of Pakistan shall be Urdu and Bengali.

২১৪. (১) উর্দু এবং বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৫৯ সালের ৬ই জানুয়ারি সামরিক শাসকগোষ্ঠী এক সরকারি বিবৃতি জারি করে এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উল্লিখিত দুই রাষ্ট্রভাষার ওপর সরকারি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কোর কাছে লিখিতভাবে প্রস্তাব করে, যা ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সংস্থার ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়ে পাস হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ দিন প্রত্যুষে সর্বস্তরের মানুষ খালি পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে এবং শহিদমিনারে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। সারাদিন মানুষ শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো ব্যাজ ধারণ করে। এছাড়া আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তর্পণ করা হয় এবং ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দিনটি কখনো জাতীয় শোক দিবস, কখনো বা জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলাদেশে এ দিনে সরকারি ছুটি। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একুশে পদক প্রদান করে। আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি ভাষা শহিদদের ।

জায়েদুল আলম: লেখক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক

জাতীয় জীবনে প্রমিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা

রফিকুর রশীদ

ভাষা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এক জায়গায় এসে ভারি খটকা লাগে— মাতৃভাষার সঙ্গে মান-ভাষা বা প্রমিত ভাষার কি বিরাট কোনো বিরোধ আছে? সহাবস্থানের সমান্তরালে কি প্রবাহিত হতে পারে না দুটি ধারা? আমাদের অতি প্রিয় আদরণীয় বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক। এত যে লড়াই-সংগ্রাম, এত যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-অশ্রুপাত, এই মধুর ভাষার জন্যেই তো!

মায়ের মতো সর্বংসহা এই ভাষার মধ্যেই জন্মগ্রহণ এবং জীবনযাপন করেও সব অঞ্চলের বাংলাভাষী কি সহজ-সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করতে পারছে বাংলা ভাষা? হ্যাঁ, মানি বটে, আয়তনে ছোটো হলেও আমাদের এই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় বিশাল বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে দুর্বোধ্য, আড়ষ্টতা এবং দূরত্বও সৃষ্টি করেছে। নোয়াখালীর ভাষা খুলনার মানুষ বোঝে না, বরিশালের মানুষ বোঝে না চট্টগ্রামের ভাষা। অথচ বাঙালি আমরা সবাই, বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা; তাহলে মাতৃভাষা কোনটি?

খুব সহজভাবে বলতে গেলে মায়ের মুখের ভাষাকেই সবাই মাতৃভাষা বলবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। জন্মদাত্রী মানবী মা এবং দেশমাতার ভাষা কি সর্বদা অভিন্ন হয়? মাতৃদুগ্ধ পান কেমন করে করতে হয়, সেটাও যেমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখে নেয় শিশু, মাতৃভাষা শেখার ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকমই। ব্যাকরণ বা মাস্টারমশাইয়ের শাসন-বারণ লাগে না। শিক্ষার্থী বারংবারের চেষ্টায়, নিজে থেকে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে ব্যাখ্যাতীত স্বাভাবিকতায় শিখে নেয় তার মাতৃভাষা। জন্মসূত্রে মায়ের মুখের বুলি অনুসরণ করেই মানুষের ভাষা শিক্ষার সূচনা হয়। যেমন শোনে, তেমনই শেখে ভাষা, আবার সে ভাষার তেমন ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়। সেটাই স্বাভাবিক। উচ্চারণ, বাক্-রীতি, ক্রিয়াপদের ব্যবহার, বাক্য গঠন ভঙ্গিমা— এসব কিছু মানুষ লাভ করে বিশেষ প্রশিক্ষণ বা আলাদা প্রচেষ্টা ছাড়াই তার মায়ের কাছ থেকে। এই ভঙ্গিতেই তার স্বস্তি, আরাম এবং আনন্দও। আর এই আনন্দের ভাষাই মাতৃভাষা। মাতৃভাষার চেয়ে আনন্দময় এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ মাধ্যম আর কীইবা হতে পারে! আমাদের দেশের অন্যতম এক প্রধান কবি একদা দাবি করেছিলেন— চাটগাঁইয়া ভাষাই তার মাতৃভাষা, আর বাংলা তার দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র তিনি, ইংরেজি সাহিত্যেও বিস্তর দখল তার; কবিতা লেখেন বাংলায়। সে বোধ হয় বছর তিরিশেক পেছনের কথা, তখন খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়েছিলাম বাংলাকে তার দ্বিতীয় ভাষা বলায়। এখন বুঝি তার এ বক্তব্যে সততা ছিল একশো ভাগ, সেদিন তিনি অকপটেই উচ্চারণ করেছিলেন— চাটগাঁইয়া তার মাতৃভাষা।

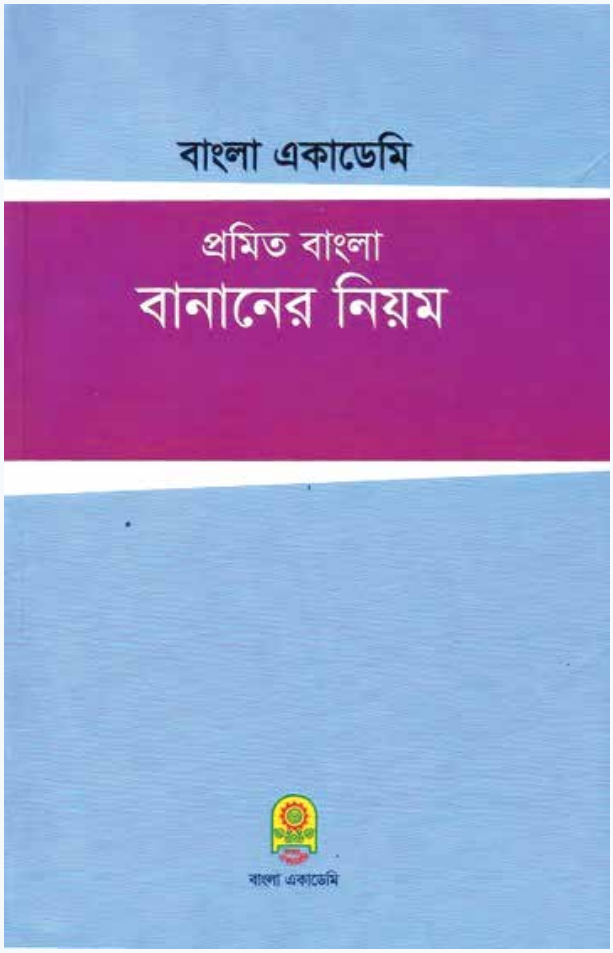

বড়ো হতে হতে মানুষের কত কিছু বদলায়। ঘষেমেজে রঙে-রূপে বদলায়। চেহারায় শুধু নয়, চরিত্রেও বদলায়। মানুষ ধীরে ধীরে জন্মের আবিলতা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসে পরিচ্ছন্নতায়। তাই বলে ফেলে আসা আবিলতার কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োজনে মানুষ নিজের উত্তরণ ঘটায়। শৈশব থেকে বড়ো হতে হতে, স্কুল-কলেজে যেতে যেতে, বইপুস্তক ও শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শে আসতে আসতে শিশুর স্বাভাবিক ভাষা প্রবাহ কিঞ্চিত বিঘ্নিত হয়, পরিমার্জিত হয়; সেই সাথে খানিকটা কৃত্রিমও হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা বলেন— প্রমিত হয়ে ওঠে। এভাবেই ধীরে ধীরে মান-ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। ভাষার মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই মান-ভাষায় পৌঁছুতে গিয়ে ভাষার স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা যে ব্যহত হয়— এটাও মানতে হবে।

মানুষের মুখের ভাষা তো নদীর স্রোতের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমান। বাধাবন্ধন তার গতি। মানুষ তার প্রয়োজনে নদীকেও

শাসন করে, তার স্রোতোধারাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। স্বাভাবিক গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে নদীর গতিমুখ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় মানুষ, অনেক সময় সফলও হয়। ভাষার গতির ক্ষেত্রেও কি এই প্রচেষ্টা সফল হয়! মানবসৃষ্ট সেই কৃত্রিম এবং জগাখিচুড়ি ভাষা যতই বুদ্ধি ও মেধাশাসিত হোক না কেন, তা যে কালের বিচারে টেকসই হয় না, সে প্রমাণ ভাষার ইতিহাস ঘাটলেই পাওয়া যাবে। তবে মান- ভাষার ব্যাপারটা আলাদা। পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত ভাষাই অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যময় বাগান থেকে পুষ্পরাজি চয়ন করে নতুন সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সুরভিত হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। *চর্যাপদের* ভাষা আর বঙ্কিমের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা আর জীবনানন্দের ভাষা অভিন্ন সেই বাংলা ভাষাই বটে, তবু সময়ের চাকা ঘুর্ণনে ও ঘর্ষণে কত না পরিবর্তন ঘটেছে এবং জীবন্ত ভাষা বলেই আধুনিক বাংলা ভাষায় এখনো সে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এ পরিবর্তন অনিবার্য, ভাষার বাঁচা-মরার প্রশ্নেই সেটা অনিবার্য। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিবর্তনের নামে আমাদের ঐশ্বর্যময়ী বাংলা ভাষায় বিচিত্র শব্দপ্রয়োগ, বিকৃত উচ্চারণসহ আরও যে সব নর্তন-কুর্দনের আলামত দেখা যাচ্ছে তাতে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।

ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের আরও একটি কারণ– আঞ্চলিক ভাষার বাগ্‌ভঙ্গিমার বেড়া অতিক্রমে অনাগ্রহ কিংবা অক্ষমতা। আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত (এমনকী বাংলায় এমএ পর্যন্ত) ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি যারা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলেন, অথচ সঠিক উচ্চারণে প্রমিত বাংলা বলতে পারেন না। ক্লাসরুমের শিক্ষকতায় কিংবা আদালতের ওকালতিতেও অসংকোচে আঞ্চলিক বাংলা উচ্চারণ করেন। এ জন্যে কোনো গ্লানিবোধ নেই। কারণ জানতে চাইলে দিব্যি বলে ফেলেন, 'ছুড়ুকালের অভ্যাস যে!' আহা, এখন তো অনেক বড়ো হয়েছেন, ছোটোবেলার অনেক অভ্যাসই তো পরিত্যাগ করেছেন, শিক্ষিত মানুষ হয়েও শুধু মুখের ভাষার বেলাতেই পিছিয়ে থাকবেন? তখনও স্মিতহাস্যে কেউ কেউ অবলীলায় বলেন, 'মায়ের ভাষা মিডা লাগে যে!' মুখের ভাষার এই মিষ্টতার পরে আর কোনো যুক্তিই চলে না।

মাতৃদুগ্ধের মিষ্টতাও তো আমরা এক সময় পরিহার করি, প্রয়োজনে অন্যান্য খাদ্য উপাদানে মিষ্টত্বের সন্ধান করি। ভাষার প্রশ্নেও সেই কথা খাটে। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে নয়, সেই ভাষাভঙ্গির সৌন্দর্যসুধা প্রমিত ভাষাভঙ্গিতে যুক্ত করে সবাই মিলে ব্যবহার করতে না পারলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। একাত্তরে এত বড়ো যুদ্ধ জয়ের পরও 'পূর্ববঙ্গের বাঙাল' পরিচয় অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের পরিচয়ে সত্যিকারের বাঙালি হয়ে উঠতে আর কতদিন লাগবে?

তিরিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে এবং বহু বছরের সাধনায়-সংগ্রামে পাওয়া আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একদা পরিচিতি ছিল 'পূর্ববঙ্গ' নামে। আর এই পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্যের কারণে বলা হতো 'বাঙাল'। ভারতের বাংলাভাষীরা এখনো সুযোগ পেলেই বাঙাল বলে কটাক্ষ করে। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতা হচ্ছে এই বাঙালেরাই বাঙালিত্বের অহংকারে এবং বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী মানুষের বাস আছে ঠিকই, তবু জাতীয়তাভিত্তিক পরিচয়ে এই বাংলাদেশের নাগরিকেরাই মাথা উঁচু করে দাবি জানাতে পারে– আমরা বাঙালি, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরাই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছি। তবুও কি প্রমিত বাংলা কিংবা মান-ভাষা বাংলা এ দেশের মানুষের কাছে 'দ্বিতীয় ভাষা' হয়েই থাকবে? ইংরেজিসহ যে-কোনো বিদেশি ভাষা সড়োগড়ো করে শিখতে পারবে বাঙালি, ব্যবহারও করতে পারবে তার প্রয়োজনে, কেবল নিজের ভাষা বাংলাকেই পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বাংলাভাষীর কাছে সমান বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে পারবে না?

রফিকুর রশীদ: কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

প্রাণের মেলা, জ্ঞানের মেলা, অমর একুশের গ্রন্থমেলা

রহিম আব্দুর রহিম

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাঙালির প্রাণের মেলা, জ্ঞানের মেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে। মাসব্যাপী এ বইমেলার সমাপ্তি ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ১লা ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় আমাদের ঐতিহ্য ও গর্বের মাসব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলা একাডেমির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের সাহসী তরুণদের এই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। এই বিজয়ের মাধ্যমে এসেছে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার ইস্পাত কঠোর প্রতিজ্ঞা। তিনি তাঁর বক্তব্যে অমর একুশের চেতনা এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে স্মরণ করে বলেন, মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত অভ্যুত্থান এবারের বইমেলায় নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। বরাবরই একুশে মানে জেগে ওঠা। একুশে মানে আত্মপরিচয়ের সাথে মুখোমুখি হওয়া। একুশে মানে অবিরাম সংগ্রাম। নিজের পরিধিকে আরও অনেক বাড়িয়ে নেওয়া। এবারের একুশের প্রেক্ষিত আমাদেরকে নতুন দিগন্তে প্রতিস্থাপন করেছে।

তিনি আরও বলেন, বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের বুকের রক্তে যে অঙ্গীকার মাখা ছিল তাতে ছিল জুলাই অভ্যুত্থানকে নিশ্চিত করার মহা বিস্ফোরক শক্তি। অর্ধ শতাব্দী পর এই মহা বিস্ফোরণ গণ-অভ্যুত্থান হয়ে দেশ পাল্টে দিলো। এই বিস্ফোরণ আমাদের মধ্যে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় গ্রোথিত করে দিয়ে গেল। ১৭ কোটি মানুষের প্রতিজনের সত্তায় এই প্রত্যয় গভীরভাবে গ্রোথিত। অমর একুশের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই প্রত্যয়ে শপথ নিতে এসেছি।

একুশ আমাদের মূল সত্তার পরিচয়। একুশ আমাদের ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছোটো-বড়ো, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, ক্ষণস্থায়ী-দীর্ঘস্থায়ী সকল দূরত্বের উর্ধ্বে। এজন্য সকল প্রকার জাতীয় উৎসবে, সংকটে, দুর্যোগে আমরা শহিদমিনারে ছুটে যাই। সেখানে আমরা স্বস্তি পাই। শান্তি পাই। সমাধান পাই। সাময়িকভাবে অদৃশ্য ঐক্যকে আবার খুঁজে পাই। একুশ আমাদের মানসকে এভাবে তৈরি করে দিয়েছে। একুশ আমাদের পথ দেখায়। একুশ আমাদের জাগিয়ে তোলে। মাত্র ছয় মাস আগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাতিকে এক ঐতিহাসিক গভীরতায় ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রারম্ভে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণ-মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক বইমেলা আয়োজনের চেষ্টা করছি।

বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তার বক্তব্যে বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই বছর বইমেলাও এই চেতনার আলোকে আবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়। একশো বছর আগে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তার উত্তরসাধক হিসেবে আজকের তরুণ লেখকদের চিন্তার বদ্ধতা অতিক্রম করে উন্নত মন ও মননের সাধনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের মহান নেতাদের মহান কর্মের জন্যই আজ আমরা এতদূর আসতে পেরেছি, তাঁরাই আমাদের পথপ্রদর্শক।

১লা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আমন্ত্রিত অতিথি, ফেলো, আজীবন ও সাধারণ সদ্যসগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণ পূর্ব থেকে বিন্যাস করা আসন গ্রহণ করেন। ঘড়ির কাটায় তিনটা বেজে চৌদ্দ মিনিটে সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশেন করেন শিল্পী ফেরদৌস আরার পরিচালনায় সুর সপ্তক সংগীত একাডেমির শিল্পীগণ। ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ, সূচনা সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গাওয়া হয়। এরপরই ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, বাংলা একাডেমি অমর একুশে বইমেলার আয়োজন করে। আমাদের সংস্কারমুখী মনোভাব প্রয়োজন, যাতে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সেতুবন্ধ তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন, নতুন সময়ের নতুন বাংলাদেশ। আত্মসমালোচনা হবার দরকার। নতুন বাংলা একাডেমির জন্য সংস্কার হবার দরকার। যে সংস্করণে বাংলা একাডেমি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রুটিন দায়িত্বরত সচিব মফিদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, এবারের বইমেলা মানে বাহান্নর চেতনা থেকে চব্বিশের প্রেরণা। জ্ঞানের সূচনা বই, আর বইমেলা নতুন বইয়ের বিপুল জোগানদার। বইকে ভিত্তি করে আমরা মুক্ত মানুষের স্বাধীন প্রকাশের উৎসব উদ্‌যাপন করব। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান বাদশা তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বই জাতীয় চেতনার প্রতীক, জাতির মননের যথার্থ সময়ের দাবি, এবারের বইমেলা সবার অংশগ্রহণে সার্থক ও সফল হবে বলে আশা করি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এরপর শুরু হয় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪ প্রদানের পালা। কবিতায় মাসুদ খান, নাট্যসাহিত্য ও নাটকে শুভাশিস সিনহা, প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্যে সলিমুল্লাহ খান, অনুবাদ সাহিত্যে জে এইচ হাবিব, গবেষণায় মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, বিজ্ঞানে রেজাউর রহমান, ফোকলোর গবেষণায় সৈয়দ জামিল আহমেদকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪-এ ভূষিত করা হয়। এরপর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বইমেলা পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের একুশের প্রাণের বইমেলার ভ্রূণ অঙ্কুরিত হয়। এবারের বইমেলার মূল প্রতিপাদ্য– 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ'। জুলাই চত্বরও রয়েছে মেলায়।

এবারের বইমেলায় অন্যান্য বছরের চেয়ে স্টলের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশি। মেলায় অংশগ্রহণ করে ৭০৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৬৩৫টি। এবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৯৯টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে স্টল ৬০৯টি প্রতিষ্ঠানের। মোট ৩৭টি প্যাভিলিয়নের ৩৬টিই স্থান পেয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাত্র ১টি। বইমেলা ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিন বইমেলা চলে বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান

শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মেলা শুরু হয় সকাল ৮টায় এবং চলে রাত ৯টা পর্যন্ত।

মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই ভাষা। শুধু যে ভাব প্রকাশের মৌলিক অধিকার খর্ব করতেই পাকিস্তানি শোষকরা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল, তা কিন্তু নয়। তারা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করতে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এগুচ্ছিল। ১৯৫২ সালের বিস্ফোরণ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে ১৯৭১-এ। ভাষা আন্দোলনে যেসব বীর একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিক নিষ্ঠুরতম গুলির আঘাতে বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম শহিদদের রক্ত যেখানে ঝরেছে, সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে ছাত্ররা একটা স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদমিনার নির্মাণ করে। এই শহিদমিনারের পাদদেশ বাঙালির সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভাষা আন্দোলনের সকল পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে। আমাদের জাতীয় শহিদমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত বর্ধমান হাউসটিই বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক 'বাংলা একাডেমি'। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সাহা বর্ধমান হাউস প্রাঙ্গণের বটতলায় চটের ওপর বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। সেই থেকে বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষটি যেমন ইতিহাসের সাক্ষী, তেমনি বটতলার রুচিশীল প্রকৃতি ও নন্দিত পরিবেশ সাহিত্যসেবীদের প্রাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'মোদের গরব' ভাস্কর্যটিও একুশের ইতিহাস বিনির্মাণে সহায়ক হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আজকের বইমেলাটি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম এই মেলা 'একুশে বইমেলা' নামে বাংলা ভাষাভাষীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত। বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে। বর্ধমান হাউস ঘিরে অনুষ্ঠিত মেলার পরিধি বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত গড়িয়েছে। এর পরিধি ১১ লাখ বর্গফুট। মায়ের সাথে যেমন সন্তানের নাড়ির সম্পর্ক, ঠিক তেমনি ভাষা আন্দোলন, বাংলা একাডেমি, শহিদমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং একুশে গ্রন্থমেলা এক মায়ের সন্তান সমতুল্য। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ঋদ্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশের ইতিহাস একইসূত্রে গাঁথা।

বইমেলার আঙ্গিকগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে মেট্রোরেল স্টেশনের অবস্থানগত কারণে গতবারের মেলার বাহির পথ এবার কিছুটা সরিয়ে মন্দির গেটের কাছাকাছি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া টিএসসি, দোয়েল চত্বর, এমআরটি বেসিং প্ল্যান্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অংশে মোট চারটি প্রবেশ ও বাহির পথ আছে। মেলার নিরাপত্তা নিয়ে ২৪ ঘণ্টা সতর্ক অবস্থানে থাকছে পুলিশ প্রশাসন।

বাঙালির কাছে একুশের বইমেলার তাৎপর্য ভিন্ন। বাঙালিদের প্রাণ ও জ্ঞানের সমুদ্রসম বইমেলার দিগ্‌দিগন্ত অতিদ্রুত প্রসারিত হয়েছে। যেখানে রয়েছে দুঃখ, হাসি, কান্না এবং জয়োল্লাসের ইতিকথা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশক, গবেষক, শিশু-কিশোর-তরুণ, যুবাসহ সকল বয়সি মানুষের কাছে আক্ষরিক অর্থেই প্রাণের মেলা। কালের পরিক্রমায় বইমেলা বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য হিসেবে অহংবোধের নিজস্ব একটা জায়গা করে নিয়েছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরের মতো এবছরও মেলায় সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি পেশার লাখো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটেছে।

রহিম আব্দুর রহিম: লেখক, নাট্যকার, গবেষক ও বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য, bskt1967@gmail.com

ভাষা আন্দোলনে নারী

ড. শিল্পী ভদ্র

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাস যেমন পুরানো, তেমনি এ দেশের নানা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাসও চমকপ্রদ। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই নারীশিক্ষার আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা যেমন আমরা জানি, তেমনি জানি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাহসিকতার গল্প। পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই ভাষার জন্য লড়াইয়ে লিলি খান বা তেভাগা বিদ্রোহের ইলা মিত্র বা হাজারো সান্তাল চাষি বা ফুলবাড়ীর আন্দোলনকারীদের মতো সাহসী নারীদের নাম আমাদের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের স্বাধিকার আর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীরা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে দেখা দেয় সত্যিকার অর্থে নারী আন্দোলনের নানা উপাদান ও উপকরণ। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন– 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। মূলত সকল আন্দোলনে নারীর প্রেরণা, শক্তি, সাহস ও অংশগ্রহণ ছিল।

১৯৫২ সালে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে দেশের আপামর জনতা নেমে এসেছিল রাজপথে। সেখানে পুরুষদের পাশে ছিলেন নারীরাও। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। মিছিল, মিটিং থেকে শুরু করে সবখানেই ছিল নারীর সক্রিয় অবস্থান। বিশেষ করে আন্দোলনের পোস্টার, ব্যানার, কার্টুন লেখায় নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল নারীদের উল্লেখযোগ্য পদচারণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রীরা রাতের আঁধারে নিজেকে গোপন রেখে নানা ধরনের স্লোগান সংবলিত পোস্টার আঁকতেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। অন্যদিকে মেডিকেলের ছাত্রীরা আন্দোলনে আহতদের নিরলসভাবে চিকিৎসা দিতেন। কেউবা আবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন আহতদের চিকিৎসা-সুব্যবস্থা করার জন্য। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নারীরাই পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ব্যারিকেড ভাঙেন। অনেকেই আবার ছাত্রদের নিজেদের কাছে আগলে রাখেন পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে অনেক নারীকে জেল খাটতে হয়েছে, কাউকে আবার ছাড়তে হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাংলা ভাষার দাবিকে জোরদার করতে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার রূপ দিতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কত নারী যে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করেছেন তার প্রকৃত ইতিহাস লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গিয়েছে। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের দৃশ্যমান ভূমিকাগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনালোচিত থেকেছে।

১৯৪৭-এ করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের একটি ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপারিশ করা হয়। তখন থেকে ভাষা আন্দোলনের দানা বাঁধে। বাংলা ভাষার দাবিকে জোরদার করতে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'তমদ্দুন মজলিস' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। অন্দরমহলে অবস্থান করেও আবুল কাশেমের স্ত্রী রাহেলা, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া ভাষা আন্দোলনের জন্য কাজ করে গেছেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে জানুয়ারি রাত ৪টার দিকে আবুল কাশেমের বাসা ঘিরে ফেলে পাকিস্তান পুলিশ। ভেতরে আবুল কাশেম ও আব্দুল গফুরসহ অন্যরা ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র সৈনিক পত্রিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পুলিশ দরজায় বার বার আঘাত করলে মিসেস রাহেলা কাশেম গভীর রাতে পারিবারিক বাসায় পুলিশ প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ সুযোগে আবুল কাশেমসহ অন্যরা পেছনের দেয়াল টপকে পালাতে সক্ষম হন। এরপর পুলিশ ভেতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়। ভাষা আন্দোলন শুরুর দিকে অন্দরমহলে নারীর এই অবদান আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভায় ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজপথের সেই মিছিলে সামনের সারিতে অবস্থান ছিল ছাত্রীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলনকে চাঙা করতে অর্থ সংগ্রহ ও রাতভর পোস্টার লেখার কাজ করেন। এ সময়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেলে অনেক ছাত্রী আহত হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটা রওশন আরা বাচ্চুসহ আরও কয়েকজন ছাত্রীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অনেক ছাত্রী আহত হন। এরমধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বোরখা শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম প্রমুখ ছিলেন স্মরণীয়।

ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণে সবচেয়ে স্মরণীয় হলো ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন ছাত্রী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে লায়লা নূর, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, রওশন আরা বাচ্চু, ফরিদা বারি, জহরত আরা, কামরুন নাহার লাইলি, হোসনে আরা, ফরিদা আনোয়ার ও তালেয়া রহমান অন্যতম।

ঢাকার বাইরে নারীরা ভাষা আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণগঞ্জের মমতাজ বেগম। নারায়ণগঞ্জের মরগান হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস মমতাজ বেগম স্থানীয়ভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে স্বামীর তালাকপ্রাপ্ত হন। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও শাবানীর মতো কিশোরীকেও পুলিশ সেদিন গ্রেপ্তার করে। সিলেটের কুলাউড়ার সালেহা বেগম ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীন ভাষা শহিদদের স্মরণে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন করার অপরাধে সেখানকার জেলা প্রশাসকের আদেশে স্কুল থেকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার হন।

চট্টগ্রাম ও সিলেটে ছাত্রীরা আন্দোলনে জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। এদের মধ্যে স্কুলের কোমলমতি কিশোরীদের অংশগ্রহণই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ভাষা সৈনিক চেমন আরার মতে, তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম সদস্য হলেন আনোয়ারা খাতুন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং বাহান্নর ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। গাইবান্ধার বেগম দৌলতুন্নেছাও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনিও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন ১৯৫৪ সালে। নাদেরা বেগম ও লিলি হকের নামও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হামিদা খাতুন, নুরজাহান মুরশিদ, আফসারী খানম, রানু মুখার্জী প্রমুখ নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংসতার প্রতিবাদে অভয় দাস লেনে এক সভায় নেতৃত্ব দেন বেগম সুফিয়া কামাল ও নুরজাহান মুরশিদ। ধর্মঘট উপলক্ষে প্রচুর পোস্টার ও ব্যানার লেখার দায়িত্ব পালন করেন ড. শাফিয়া খাতুন ও নাদিরা চৌধুরী। ১৯৪৭ সালে *আজাদ পত্রিকায়* বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একটি লেখা প্রকাশ হলে যশোরের হামিদা রহমান একটি নিবন্ধ লেখেন। পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। এ সময় সুফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন নামে দুজন নারীর নাম শোনা যায়, যাঁরা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। সিলেটের মেয়েরাও ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট প্রতিনিধিও পাঠান। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সিলেটের মুসলিম লীগের নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাহারা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা, রাবেয়া বেগম প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রামের বেশ কিছু কলেজ ছাত্রী এবং সে সময়ের নারীরাও যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম তোহফাতুন্নেছা আজিম, সৈয়দা হালিমা, সুলতানা বেগম, নুরুন্নাহার জহুর, আইনুনু নাহার, আনোয়ারা মাহফুজ, তালেয়া রহমান, প্রতিভা মুৎসুদ্দি। খুলনাতেও কাজ করেছেন তমদ্দুন মজলিসের কর্মী আনোয়ারা বেগম, সাজেদা আলী এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীরা। সাতক্ষীরায় সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন গুলআরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী। টাঙ্গাইলে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন নুরুন্নাহার বেলী, রওশন আরা শরীফ। রংপুরে এই সময় নারীরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন নিলুফা আহমেদ, বেগম মালেকা আশরাফ, আফতাবুন্নেছা প্রমুখ। ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ড. জাহানারা বেগম

বেনু, মনোয়ারা বেগম বেনু, ডা. মহসিনা বেগম, ফিরোজা বেগম ফুনু, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি, রওশন আরা, খুরশিদা বানু খুকু, আখতার বানু প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের নকশায় ছিলেন চট্টগ্রামেরই এক সৃজনশীল নারী ভাস্কর নভেরা আহমেদ। তিনি শিল্পী হামিদুর রহমানের সাথে শহিদমিনারের নকশা তৈরি করতে নিরলস শ্রম দিয়েছেন।

ভাষা আন্দোলনে নারীরা সক্রিয়ভাবে মিছিল, প্রতিবাদসভা ও সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও তহবিল গঠন, চাঁদা সংগ্রহ এবং পোস্টার তৈরি করে বিক্রি করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি বক্তব্য রেখেছেন গণজমায়েতে, নেতৃত্ব দিয়েছেন মিছিলে, সহ্য করেছেন পুলিশি নির্যাতন। কারাবরণ, হুলিয়া ভোগ, সাময়িক আত্মগোপনকারীদের আশ্রয় দিয়ে একাত্ম প্রকাশ করেছেন। শহিদমিনার নির্মাণের খরচ জোগার করতে অনেক মেয়ে গায়ের অলংকার খুলে দিয়েছেন।

নারীদের অবদান প্রতিটি স্তরেই রয়েছে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে, যে মা তার সন্তানকে আন্দোলনে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছেন, সন্তানের আত্মত্যাগকে মেনে নিয়েছেন, যে নারী নিজেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, শহিদ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের অবদান রয়েছে। নারী হচ্ছে শক্তি।

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে এবং প্রক্টরের সামনে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হতো। গ্রামের নারীরা তো ছিল পর্দা প্রথার আড়ালে বন্দি। এমন সময় সামাজিক, ধর্মীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় বাধাবিপত্তি ঠেলে বাংলা ভাষার দাবিতে নারীদের রাজপথে নেমে আসা কঠিন ছিল। তারপরেও আন্দোলনে অংশ নিতে সবচেয়ে বড়ো ঝুঁকিটাই নিয়েছেন নারীরা। ভাষা আন্দোলনে নারীদের ছিল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান, যা তাদের সাহসিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। পরবর্তী সময়ে সেই চেতনা ধারণ করেই তাঁরা এগিয়ে যান, বাংলাদেশের মানচিত্রে লাল-সবুজের পতাকা আঁকতে।

যদি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি কিংবা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কথাই ধরি, তারামন বিবি ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদাররা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছিলেন বলেই স্বাধীনতা পেয়েছি। বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষকে একই যানের দুটি চাকার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একটা চাকা হচ্ছে পুরুষ আরেকটা চাকা নারী এবং পুরো গাড়ি হচ্ছে একটা রাষ্ট্র। একটা চাকা যদি ছোটো আর অন্য চাকা বড়ো থাকে তাহলে গাড়িটি কিন্তু এক জায়গাতেই ঘুরপাক খেতে থাকে। সামনের দিকে এগোয় না।

ভাষা আন্দোলনেই সুপ্ত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ, আর এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। নারী ভাষা সৈনিকদের অনেকেরই জীবনাবসান ঘটেছে। ভাষা আন্দোলনে নারীসমাজের অবদানের চর্চা আরও বেশি হোক– এই প্রত্যাশা করি। নারীর আন্দোলন-সংগ্রামের মহিমায় কালো কালির অক্ষরে ভরে উঠুক পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তৃপ্ত হোক আত্মা। ১৯৫২ থেকে নানা আন্দোলনের পথ ধরেই আসে ২০২৪-র জুলাইয়ের ছাত্র গণ-আন্দোলন। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নারী আন্দোলন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করে। এই গণ-আন্দোলনে নারীরা ছিল দারুণভাবে সক্রিয়। প্রেরণাদাত্রী ও শক্তিময়ী নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এ আন্দোলনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করেছে। আন্দোলন-সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ হোক স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি তাদের অবদান হোক বিঘোষিত।

ড. শিল্পী ভদ্র: লেখক ও গবেষক

একুশে পদক-২০২৫ প্রদান

রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নারী ফুটবল দলকে এ বছর একুশে পদক দেওয়া হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক-২০২৫' প্রদান করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পদকপ্রাপ্তরা হলেন– চলচ্চিত্রে আজিজুর রহমান (মরণোত্তর), সংগীতে ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর) ও ফেরদৌস আরা, আলোকচিত্রে নাসির আলী মামুন ও চিত্রকলায় রোকেয়া সুলতানা। সাংবাদিকতায় মাহফুজ উল্লাহ (মরণোত্তর), গবেষণায় মঈদুল হাসান, শিক্ষায় ড. নিয়াজ জামান। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মেহেদী হাসান খান (দলনেতা), রিফাত নবী (দলগত), মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম (দলগত) ও শাবাব মুস্তাফা (দলগত)। সমাজসেবায় মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর), ভাষা ও সাহিত্যে হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর) ও শহীদুল জহির (মো. শহিদুল হক) (মরণোত্তর), সাংবাদিকতা ও মানবাধিকারে মাহমুদুর রহমান, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় ড. শহিদুল আলম এবং ক্রীড়ায় বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমাদের তরুণ প্রজন্ম নতুন পৃথিবী সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিতে চায়। সে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত। ছেলেরাও প্রস্তুত, মেয়েরাও প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, দেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব যারা আজ একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের দেশবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের অবদানের জন্য জাতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা জাতির পথপ্রদর্শক। আপনাদের অবদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি দৃঢ় বিশ্বাসে জাতিপুঞ্জের মজলিসে ক্রমাগতভাবে উন্নততর অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

বাংলা ভাষার প্রসারে দরকার যুগোপযোগী পরিভাষা

ড. রুশিদান ইসলাম রহমান

বাংলা ভাষার প্রসার ও সর্বস্তরে ব্যবহার করার কথা প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটছে কি না, সে বিষয়ে খতিয়ে দেখে পর্যালোচনা প্রায় অনুপস্থিত। বাস্তবতা তার বিপরীত বলেই হয়ত সেদিকে অন্ধ হয়ে থাকছি সবাই। কিন্তু অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে! বাংলা ভাষা যে নানাভাবে পশ্চাৎপদতার দিকে যাচ্ছে, সে রকম লক্ষণ অনেক দিকেই সুস্পষ্ট।

জ্ঞানবিজ্ঞানের যে-কোনো বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তার মধ্যে বড়ো একটি হচ্ছে উপযুক্ত পরিভাষা। যারা এসব বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধ বা বই লিখছেন, তাদের অনেকেই এ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। অর্থনীতিবিষয়ক ও অন্য বেশ কয়েকটি বিষয়ের ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সংবলিত পরিভাষা কোষ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে সরকারের বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে। তারপর বাংলা একাডেমি সেটার আর কোনো পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেনি। কিছু লেখক বা গবেষক নিজ উদ্যোগে কোনো কোনো বিষয়ে পরিভাষা সংকলন প্রকাশ করেছেন।

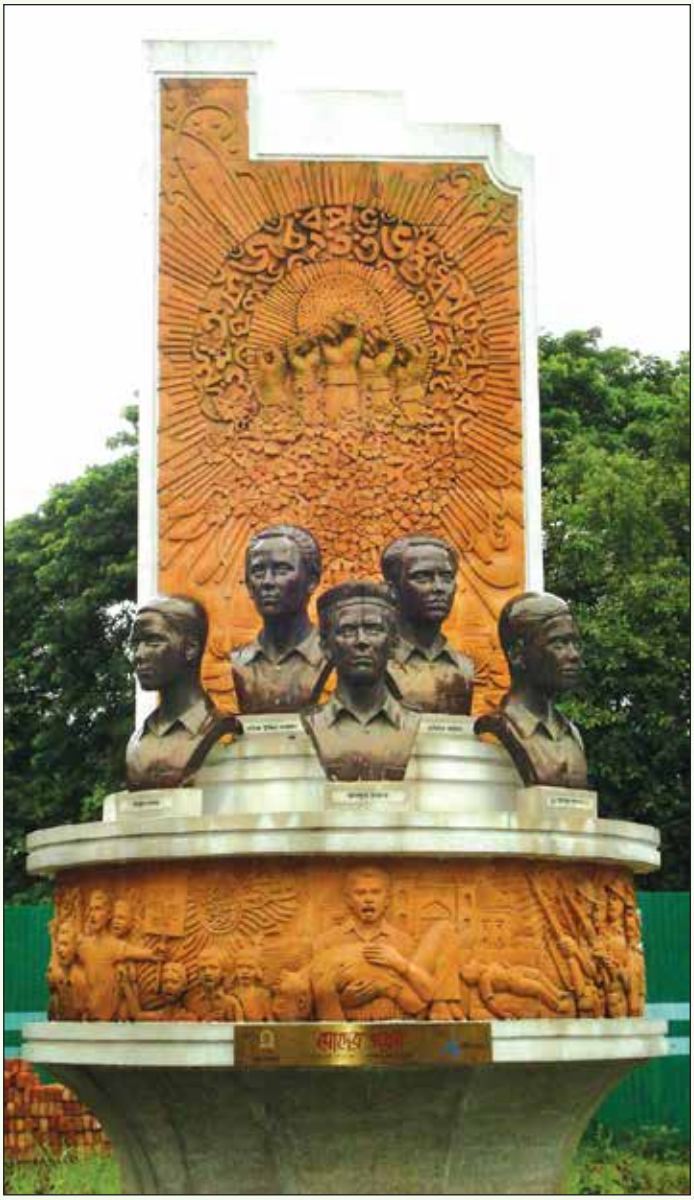

গত দু-তিন দশকে বিশ্বজুড়ে সমাজ, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত দিকে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। সেসব পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার জন্য অন্যান্য ভাষায়, বিশেষত ইংরেজিতে বহু নতুন শব্দ বা শব্দবন্ধ তৈরি হয়েছে, প্রচলিত হয়েছে। বাংলায় এসব বিষয় আলোচনার জন্য সেগুলোর পরিভাষা সর্বসম্মতভাবে প্রস্তুত করা দরকার। অর্থনীতি ও উন্নয়ন আলোচনায় প্রচলিত কিছু পরিভাষা পরিবর্তন করারও দরকার হতে পারে। এসব বিষয়ে বাংলায় প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে কিছু নতুন পরিভাষা দেওয়া আছে। কিন্তু সেগুলো সব সর্বসম্মতভাবে এক করে প্রকাশ না করলে অন্য লেখকেরা হাতের কাছে পাবেন কীভাবে!

পরিভাষা প্রণয়নের কাজ হাতে নিলে তা বিভিন্ন বিষয়ের জন্য একই সঙ্গে করা সুবিধাজনক হতে পারে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেগুলো কোন প্রতিষ্ঠানের আওতায় হবে, সে সিদ্ধান্ত আগে দরকার। অতীতে যেহেতু বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এই দায়িত্ব নিয়েছিল, এখন বাংলা একাডেমির নাম মনে আসাই স্বাভাবিক। সেটা হতে পারে অথবা সরকার আলাদা কমিশন গঠন করতে পারে বাংলা ভাষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। সেখানে শুধু পরিভাষা নয়, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও সর্বস্তরে প্রচলনের সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হবে।

মাতৃভাষা হিসেবে বাংলায় কথা বলে– এমন জনসংখ্যার প্রায় ৭৪ শতাংশ বসবাস করে বাংলাদেশে। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের বিষয়ে এ দেশের বিশাল দায়িত্ব থাকলেও অন্যান্য দেশে বসবাসকারীদের কথাও মনে রাখতে হবে পরিভাষা ও অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে। অন্যান্য দেশে তারা কোন ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করছেন, সেগুলোও বিবেচ্য।

পরিভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিদেশি শব্দের অন্তর্ভুক্তি। বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ, যা বাংলা

হিসেবে গৃহীত ও স্বীকৃত, সেগুলোর অভিধান, যা বাংলা একাডেমির তৈরি আছে, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে, সংযোজন-বিয়োজন হবে তাতে। সেখানে বিষয়ভিত্তিক শব্দমালাও থাকা দরকার।

নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে অন্য যেদিকে মনোযোগ দিতে হবে, তা হচ্ছে বাংলা টাইপ করার উন্নতমানের ফনেটিক সফ্‌টওয়্যার উদ্ভাবন। যারা সাধারণত ইংরেজি ভাষায় টাইপ করেন, তাদের তখন সেই একই কি-বোর্ড দিয়ে কাজ চলে যায়। এ ধরনের কিছু মুক্ত সফ্‌টওয়্যার আছে। সেগুলোয় নানা সমস্যা আছে, আর বাংলা একাডেমির বানানরীতি সব সময় মানা হয়নি বা মানা হলেও সেটি

যেসব সম্ভবপর শব্দতালিকা দেওয়া হয়, তার শুরুতে থাকে না। তখন লেখককে আবার অভিধান ঘেঁটে খুঁজতে হয়।

বাংলা ভাষার কিছু বিশেষত্ব আছে, যেগুলো যথাযথভাবে মানা উচিত গবেষণাগ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে। দু-একটা নিয়ম সমাজবিজ্ঞান বা অর্থনীতির বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। একটি উদাহরণ দিলে বোঝানো সহজ হবে। বাংলায় সর্বনামে তুমি, আপনি, তাঁরা/তারা, সে/তিনি ইত্যাদি দুই ধরনের ভাগ থাকে। ক্রিয়াপদেও তখন সুর মিলিয়ে সম্মানসূচক রূপ ব্যবহার করার কথা। এগুলো একেবারে নিয়ম করে সব লেখকের ওপর চাপানো হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলে একটা ধরন-ধারণ বের হয়ে আসবে।

আধুনিক যুগের আরেকটি প্রয়োজনের কথা মনে করাতে হয়। বিশাল দৈর্ঘ্যের বাংলা অভিধান অনলাইনে দিয়ে বাংলা একাডেমি অনেকের ধন্যবাদ পাচ্ছে। সেভাবেই সব পরিভাষা কোষ, অন্যান্য অভিধান, বানানরীতি ইত্যাদি অনলাইনে থাকা দরকার। শেষ করার আগে উল্লেখ না করলেই নয়, এসব আয়োজন তো শুধু জোগানের দিকে সাহায্য করবে। উন্নতমানের গবেষণাগ্রন্থ বা আকরগ্রন্থ রচনা ও অনুবাদে এগুলো প্রয়োজন। তবে সেই সঙ্গে এসব গ্রন্থের চাহিদাও বাড়াতে হবে ছাত্র-শিক্ষক সবার আগ্রহ তৈরির মাধ্যমে। উৎসাহ থাকতে হবে ব্যাবসাবাণিজ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের, বাংলায় দক্ষতাকে গুরুত্ব দিতে হবে নিয়োগ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে।

ড. রুশিদান ইসলাম রহমান: সাবেক গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস
[সূত্র: প্রথম আলো, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫]

জুলাই যেন একুশের বইমেলার প্রাণ

ঝর্ণা রায়

‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘হামার বেটাক মারলু ক্যানে?’, ‘বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর’– জুলাই বিপ্লব নিয়ে এমন অসংখ্য স্লোগান সংবলিত পোস্টার দেখা যাচ্ছে মেলার প্রবেশ পথেই। শুধু প্রবেশ পথ নয়, জুলাই আন্দোলনের এমন হাওয়া পুরো বইমেলাজুড়ে। স্টলে স্টলে জুলাই অভ্যুত্থান সম্পর্কিত বইমেলায় ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। ক্রেতারা দেখছেন, কিনছেন আবার ছবি তুলছেন।

অমর একুশে বইমেলা মানেই বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ভাষার জন্য শহিদের আত্মত্যাগ। তবে সে সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জুলাই আন্দোলন। ব্যানার, ফেস্টুন, গ্রাফিতিসহ নানারকম

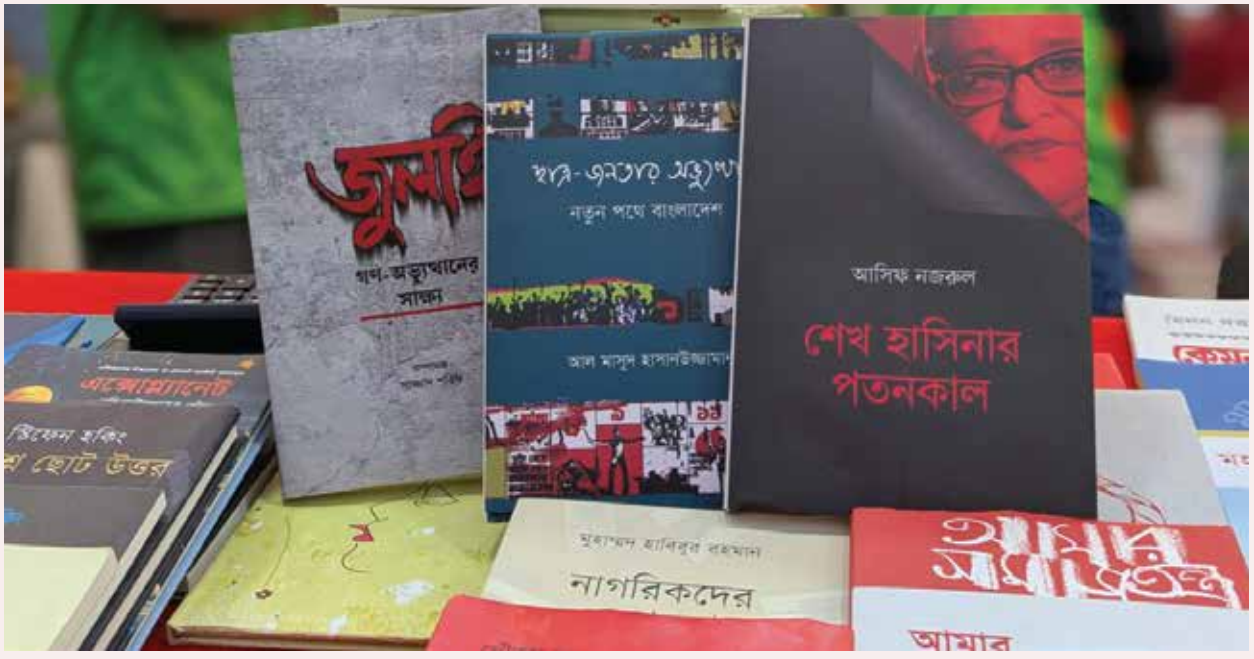

আয়োজনে তুলে ধরা হয়েছে জুলাই আন্দোলনকে। শুধু তা-ই নয়, স্টলগুলোর থিম এবং 'জুলাই চত্বর' স্থাপন করে অভ্যুত্থানের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে নান্দনিকভাবে। আর এসব সজ্জায় রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে লাল, কালো ও সাদা। স্লোগানের পোস্টার, শহিদদের ছবি, দাবি ও অধিকার আদায়ের ফেস্টুন এবং স্বৈরাচারবিরোধী গ্রাফিতি সহজেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে।

শুধু ব্যানার, ফেস্টুনেই আটকে নেই জুলাই অভ্যুত্থান। ২০২৪-এর অভ্যুত্থান স্থান পেয়েছে বইয়ের পাতায় পাতায়। অন্নি ইসলামের সম্পাদনায় এবারের বইমেলায় এসেছে বই *আমার দেখা গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪*। মেহেদী হাসান ডালিম লিখেছেন *হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান*, ফারজানা মাহবুবার লেখা *হ্যাশট্যাগ জুলাই* এবং সাব্বির জাদিদের লেখা *একটি গোলাপের জন্য*। এমন অনেক লেখকর বই প্রকাশ হয়েছে এবারের বইমেলায়। ভিন্ন ভিন্ন স্টলে রয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক বই। ঐতিহ্য প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে এমন তিনটি বই– *জুলাই*, *ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান* এবং আসিফ নজরুলের লেখা *শেখ হাসিনার পতনকাল*। এই স্টলের বিক্রেতা রোখসানা জানিয়েছেন, অন্য বইয়ের চেয়ে জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা বই বেশি বিক্রি হচ্ছে।

বই, পোস্টারের পাশাপাশি জুলাইয়ের স্মৃতিকে আরও একবার স্মরণ করার জন্য একুশের বইমেলায় আছে একটি ফটোবুথ। রঙিন স্লোগান অঙ্কিত ফটোবুথটির নাম '৩৬ জুলাই'। ফটোবুথের ভেতরে আঁকা হয়েছে দুই হাত প্রসারিত আবু সাঈদের ছবি। সামনে ও দুই পাশে আন্দোলনের সময়কার নানান ঘটনা আঁকা রয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি, পুলিশি নির্যাতন, ছাত্রলীগের হাতে নিগ্রহের মতো ঘটনাও আঁকা হয়েছে সেখানে।

বইমেলায় আসা দর্শনার্থীরা ফটোবুথে এসে ছবি তুলছেন। সন্তানকে ছবি দেখিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকরা। এমন একজন মো. আবুল কালাম। তিনি *সারাবাংলাকে* বলেন, এখানে এসে খুব ভালো লেগেছে। যা ঘটেছে তা ফের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বাচ্চা জানতে চাচ্ছে, আমি তাকে বলেছি।

মেলায় অংশ নিয়েছে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন। সেখানে রক্তাক্ত জুলাই নামে একটি ফটোবুক বের করা হয়েছে। বুকটি বিক্রি করে যে অর্থ আয় হবে তা দিয়ে জুলাইয়ে শহিদ পরিবার ও আহতদের সহযোগিতা করা হবে। জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সামনেই রাখা হয়েছে বড়ো বড়ো ফেস্টুন। সেখানে জুলাই-আগস্টে শহিদ মো. ওয়াসিম আকরুম, আবু সাঈদ, গোলাম নাফিজ, মাহামুদুর রহমান সৈকত, শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের ছবি রয়েছে। সেই সঙ্গে শহিদ মুগ্ধর পানির গ্লাস হাতে

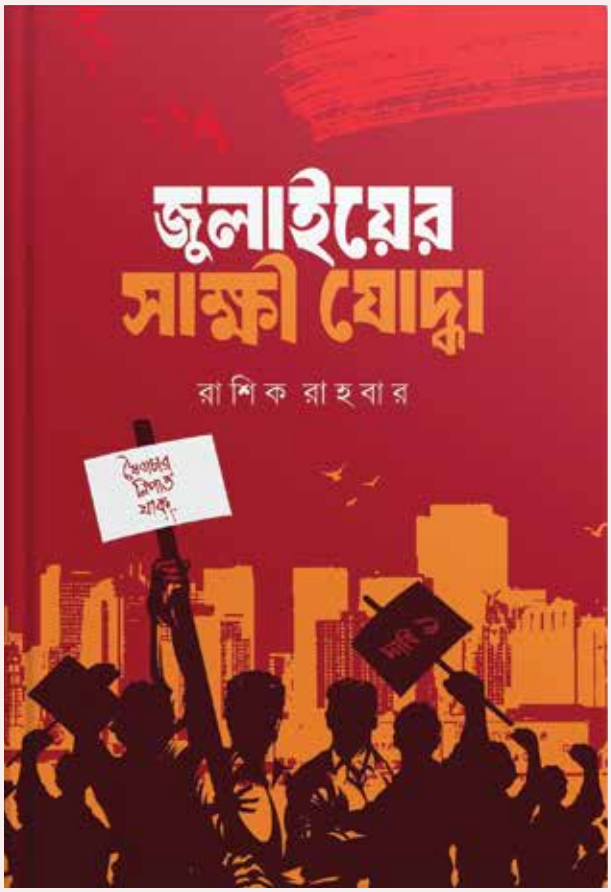

স্ট্যাচু। তার সামনেই জুলাই চত্বর। সেখানে নানা স্লোগান সংবলিত পোস্টার মানুষ দেখছেন, ছবি তুলছেন।

এছাড়াও আন্দোলনের সময় গুলি ছুড়তে থাকা সন্ত্রাসীর মুখ আঁকা হয়েছে নেকড়ের মতো করে। যেন বীভৎস হত্যাযজ্ঞ আর হিংস্রতার প্রতিরূপ। মেলা ঘুরে মনে হয় জুলাই যেন এবারের অমর একুশে বইমেলার প্রাণ।

[সূত্র: সারাবাংলা, ১৭ই ফেব্রুয়ারি]

একুশে পদক গ্রহণ করলেন অভ্র কিবোর্ডের জনক মেহেদী ও তার বন্ধুরা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক

গ্রহণ করেছেন অভ্র কিবোর্ডের চার নির্মাতা। তারা হলেন– মেহেদী হাসান খান (দলনেতা), রিফাত নবী (দলগত), মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম (দলগত) ও শাবাব মুস্তাফা (দলগত)। ২০শে ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

২০০৩ সালে চালু হওয়া অভ্র কিবোর্ড বাংলা টাইপিংয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। ধ্বনিগত টাইপিং পদ্ধতির মাধ্যমে এটি ব্যবহারকারীদের জটিল কিবোর্ড লেআউট ছাড়াই বাংলা লেখার সুযোগ দেয়, যা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটি বাংলা ভাষার ডিজিটাল প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে অভ্র'র চার নির্মাতার অবদান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেল, যা বাংলা ভাষা প্রযুক্তির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে এই ক্যাটাগরিতে একুশে পদকের জন্য প্রথমে শুধু মেহেদী হাসান খানকে মনোনীত করা হয়েছিল, যাকে অভ্র কিবোর্ড তৈরির কারিগর বলা হয়। তবে পরবর্তীতে মেহেদী হাসানের অনুরোধে অভ্র তৈরিতে তার সঙ্গে বাকি তিনজনকেও পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: সাদমান রাফি

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য, প্রত্যাশা ও করণীয়

ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান

সমাজ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানব জ্ঞানেরও পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। বিকশিত হয়েছে জ্ঞানের বহুবিধ প্রকৃতি ও ধারার। জ্ঞানচর্চা, সংরক্ষণ ও বাহনের জন্য মানব জ্ঞানকে ধারণ ও ধারণকৃত জ্ঞানকে যুগ-যুগান্তরে মানব কল্যাণে বিতরণের জন্য কালের আবর্তে একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যার বর্তমান নাম হলো গ্রন্থাগার। মানব সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের হলেও গ্রন্থাগারের ইতিহাস ৪০০০ থেকে ৪৫০০ বছর মাত্র। আর আধুনিক গ্রন্থাগারের ইতিহাস ২০০০ বছরের অধিক নয়। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকে আধুনিক গ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ এই গ্রন্থাগারের বিষয়ভিত্তিক পুস্তক বিন্যাস, সেবার ধরন ও পাঠদান অনেকটাই বর্তমানের ন্যায় ছিল। প্রাচীন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে থাকতেন লেখক-পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। গ্রন্থাগারিকতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও পেশাদার গ্রন্থাগারিক হিসেবে এসব ব্যক্তিরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পুস্তক সংগ্রহ, কপি ও সংরক্ষণ করতেন এবং জ্ঞানের চর্চায় মগ্ন থাকতেন।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন নয়। তবে মঠ, মন্দির, মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপনের নজির কয়েক শত বছর হলেও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ১৮৫৪ সালে যশোর, বগুড়া, রংপুর ও বরিশালে স্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রথম গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৪-১৮৯৯ সালে সারাদেশে স্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে আরও ১০টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার হিসেবে ১৮৪২ সালে প্রথম ঢাকা কলেজ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত পৌনে দুইশো বছরের ব্যবধানে এখন বাংলাদেশে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কয়েক হাজার গ্রন্থাগারিকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা গ্রন্থাগার সেবার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের গ্রন্থাগারে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, তথ্যসামগ্রী সমৃদ্ধকরণ, সেবার মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনে গ্রন্থাগারিকদের নিরলস কাজের স্বীকৃতিই হলো ৫ই ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থগার দিবস ঘোষণা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার দিবস, গ্রন্থাগারিক দিবস, গ্রন্থাগার সুহৃদ দিবস, গ্রন্থাগার সপ্তাহ, গ্রন্থাগারিক সপ্তাহ বা মাস ইত্যাদি নামে পালন করা হয়ে থাকে। তবে জার্মান গ্রন্থাগারিক সমিতি ১৯০০ সালে মে মাসে জার্মানির মার্গে প্রথম 'জার্মান গ্রন্থাগারিক দিবস' পালন করা শুরু করে। আমেরিকান লাইব্রেরি

অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৮ সাল থেকে প্রতিবছর এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'জাতীয় গ্রন্থাগারিক সপ্তাহ' পালন করে আসছে। ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ড. এস আর রঙ্গনাথনের জন্মদিন ১২ই আগস্ট 'গ্রন্থাগারিক দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিও ২০১০ সাল থেকে দেশের আধুনিক গ্রন্থাগারিকতা পেশা ও গ্রন্থাগার শিক্ষার পথিকৃৎ মুহম্মদ সিদ্দিক খানের জন্মদিন ২১শে মার্চ 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পালন করে আসছিল, তবে সরকার ১৯৫৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিনটিকে (এটি বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে প্রথম সরকারি উদ্যোগ) স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশে ৫ই ফেব্রুয়ারিকে ২০১৭ সালে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য

রাষ্ট্র বা সমাজের নিকট কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হলে তা কোনো একটি দিবস পালন ঘোষণার মাধ্যমে ঐ বিষয়ের উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। দেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উন্নয়ন, জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ নির্মাণ এবং গ্রন্থমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা করা হয়। জ্ঞানার্জন, গবেষণা, চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে আলোকিত করে তোলা এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিসহ যাবতীয় জ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ডে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও বেশি সচেতন করে তোলার জন্যই জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রবর্তন। রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিদ্যমান গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার ও গ্রন্থাগারের উপকারিতার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রত্যাশা

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস সমাজ জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়ে সবার প্রত্যাশা অনেক। যেমন: জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস দেশের জনগণের মাঝে গ্রন্থাগারের উপকারিতা, গ্রন্থাগার সেবা, তথ্যসামগ্রী ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। সামাজিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিকাশ, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন, গ্রন্থাগারিকতা পেশার উৎকর্ষ সাধন, লেখক সৃষ্টি, মানসম্পন্ন গ্রন্থের প্রকাশ, পাঠক সৃষ্টি ও পাঠমনস্ক আলোকিত মানুষ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। সমাজ থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত সত্যিকার শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের করণীয়

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস একটি দিন পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি প্রতীকী দিবস, যার মাধ্যমে গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সেবায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা বছরব্যাপী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার উন্নয়ন, পাঠক সেবা, পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখে।

এ দিবসে সরকার, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠন এবং গ্রন্থাগার সুহৃদগণ বিগত বছরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র প্রকাশ করবে এবং আগামী বছরের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করবে। প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টরা সারা বছরব্যাপী এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত করবে। প্রস্তাবিত স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন হলে কর্মকাণ্ডগুলো সমন্বয়ের ও তদারকির দায়িত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত হবে।

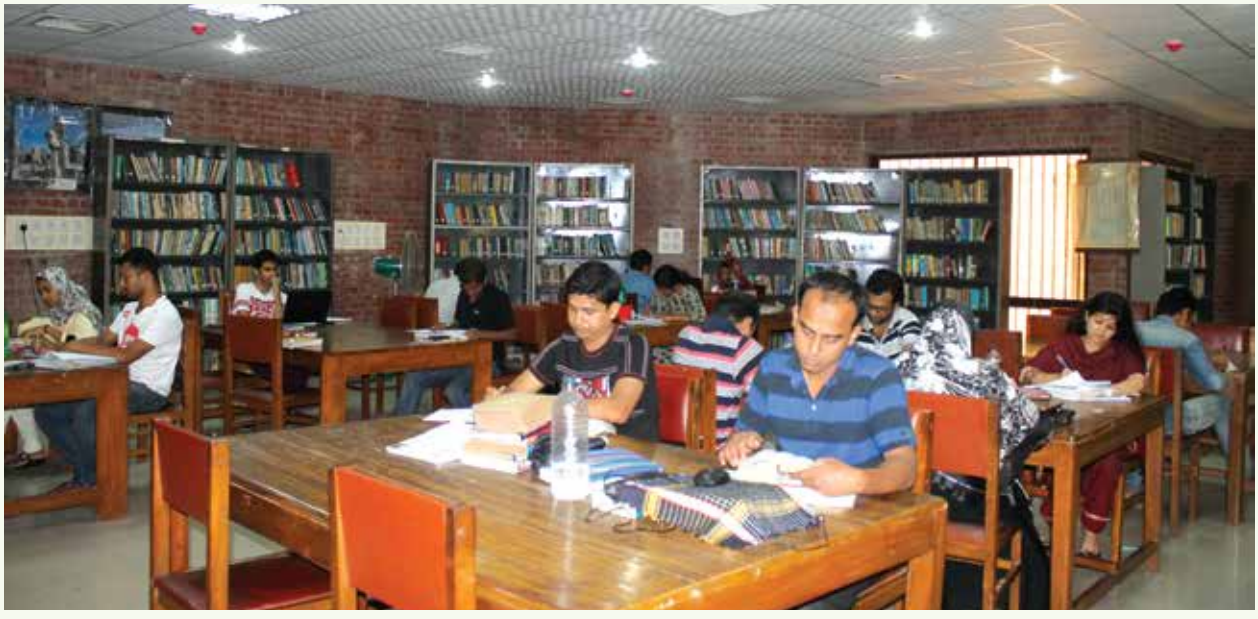

স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে স্থায়ী গ্রন্থাগার কমিশন গঠন করা যেতে পারে। কমিশন দেশের সকল গ্রন্থাগারকে একক প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করবে এবং সরকারকে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবে।

গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচারণা

গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে প্রচার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত

প্রচার করা যেতে পারে–

- জাতীয় প্রচার মাধ্যম যেমন– টেলিভিশন এবং রেডিওতে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচার ও আলোচনার আয়োজন করতে হবে।
- জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সেবার গুরুত্ব তুলে ধরে ক্রোড়পত্র, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে।
- জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইট সজ্জিত করতে হবে এবং গ্রন্থাগার সেবার গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরে মতামত, প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে।
- ইউটিউবে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম, সেবা, গুরুত্ব সম্পর্কিত ভিডিও প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক, লেখক, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার সুহৃদের সাক্ষাৎকারের ভিডিও ইউটিউবে প্রকাশ করতে হবে।
- গ্রন্থাগারিকগণ লেখক, প্রকাশক, পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের শুভেচ্ছা জানাবে এবং র‍্যালি, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।
- প্রতিটি গ্রন্থাগার তার পাঠক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের আলোচনার আয়োজন করবে।
- গ্রন্থাগার বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।
- জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের ব্যানার, পোস্টার, ডিসপ্লের ব্যবস্থা করতে হবে।
- লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, পাঠক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারপ্রেমিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে সেতুবন্ধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মিলন মেলা, গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।
- এ মিলন মেলায় দেশের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার সংগঠক, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারিক, শ্রেষ্ঠ লেখক, শ্রেষ্ঠ প্রকাশক এবং শ্রেষ্ঠ গবেষককে পুরস্কৃত করা যেতে পারে।
- জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন– বইপাঠ, আবৃত্তি, বিতর্ক, পাঠচক্র, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। এসকল কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, লেখক ও সমাজের বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ঘোষণা, রাষ্ট্র কর্তৃক দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা পেশার সম্মানজনক স্বীকৃতি। গত পৌনে দুইশো বছরের নিরবচ্ছিন্ন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হলো ৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস। দেশের গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগারিকতা পেশায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা পদক অর্জন করেছে। আশা করা যায়, গ্রন্থাগার দিবস পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণ ব্যাপকভিত্তিক গ্রন্থাগারমুখী হবে এবং নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান: সাবেক চেয়ারম্যান, বেলিড এবং বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা

[সংগৃহীত]

‘জাতীয় শহিদ সেনা দিবস’ ঘোষণা

প্রতিবছর ২৫শে ফেব্রুয়ারিকে ‘জাতীয় শহিদ সেনা দিবস’ ঘোষণা করেছে সরকার। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকার প্রতিবছর ২৫শে ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় শহিদ সেনা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তবে এদিন সরকারি ছুটি থাকবে না। দিনটি ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। যথাযথভাবে দিবসটি পালনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানা হত্যাকাণ্ডে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন। শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক দিনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের মাধ্যমে সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর আগে ২৯শে জানুয়ারি গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শহিদ পরিবারের সদস্যরা ২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঘটিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তির দাবির পাশাপাশি এ দিনটিকে ‘জাতীয় শহিদ সেনা দিবস’ ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন।

প্রতিবেদন: তাহমিনা ইসলাম

শওকত আলী : ভাষা সংগ্রামের অগ্রসেনানী

মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ

ভাষা সংগ্রামের এক মহানায়কের নাম শওকত আলী। তিনি ১৯১৮ সালের ২০শে এপ্রিল পুরাতন ঢাকার গেন্ডারিয়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শমশের আলী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং মা মেহেরুন্নেসা খাতুন গৃহিণী। খুব ছোটোবেলায় মাকে হারিয়ে বাবা এবং মামা-মামির কাছেই বেড়ে ওঠেন শওকত আলী। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী গভ. মুসলিম হাই স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তিনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভ করেন। রাজনীতি চর্চার সুবিধার্থে তরুণ বয়সে শওকত আলী গেন্ডারিয়া থেকে চলে আসেন ১৫০ নম্বর চক মোগলটুলীর পার্টি অফিসের বাড়িতে। তাঁর এই বাড়িটি ছিল ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী বাহিনীর মিলনক্ষেত্র। রাজনীতি চর্চার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ছিল এই বাড়িটি। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের পুরানো কর্মী।

ভাষা সৈনিক শওকত আলী

১৯৪৭'র ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই শওকত আলী ওতপ্রোতভাবে এ-আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং নেতৃত্ব দেন। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কার্যক্রম তাঁর ১৫০ চক মোগলটুলীর পার্টি অফিস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৯৪৭-এর ৩০শে ডিসেম্বর 'রশিদ ভবনে' অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রথম 'তমদ্দুন মজলিশের রাষ্ট্রভাষা উপ-কমিটি' গঠিত হয়। শওকত আলী এই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি তিনটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদেরই সদস্য ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সব অধ্যায়ে শওকত আলী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়– শওকত আলী, শামসুল হক, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ প্রমুখ যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার এই আন্দোলন একসময় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয় এবং সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রায় সবগুলো জেলা শহরেই সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। ঢাকার রাজপথে ঐদিন ভোর থেকেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন পয়েন্টে পিকেটিং শুরু করেন। পিকেটিংয়ের নেতৃত্বে ছিলেন শামসুল হক, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শহীদুল্লা কায়সার, আবদুল মতিন, নঈমুদ্দীন আহমদ, খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ। হরতালের সমর্থনে সেক্রেটারিয়েটের দ্বিতীয় গেটে (তোপখানা রোড) পিকেটিং করেন শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, বরকতসহ কয়েকজন। পিকেটিংয়ের এক পর্যায়ে পুলিশের আইজি জাকির হোসেন গাড়ি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এসময় শওকত আলী গাড়ির সামনে পা লম্বা করে সোজা মাটিতে শুয়ে পড়ে গাড়িটির পথরোধ করেন। পরবর্তীতে পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং আটক হয়ে জেলে যান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভাষা আন্দোলন করার দায়ে সবচাইতে বেশি পুলিশি নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন শওকত আলী।

পুরান ঢাকার উর্দুভাষী জনগণ (ঢাকাইয়া) প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। পরবর্তীতে ঢাকাইয়াদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে শওকত আলীর ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক ও ভাষা সৈনিক সানাউল্লাহ নূরী তাঁর *৪০-এর দশকের রাজনীতি এবং*

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন: *চকবাজারে ছিলেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী শওকত ভাই। তিনি ছিলেন ঢাকার স্থানীয় লোক। বিভাগ-পূর্বকালে মুসলিম লীগ সংগঠক হিসেবে পুরাতন শহরে সকলের সুপরিচিত ছিলেন তিনি। সুখে-দুঃখে সবসময় তিনি থাকতেন সাধারণ মানুষের পাশে। মিটফোর্ড রোড, চকবাজার, মৌলভীবাজার এবং লালবাগ এলাকায় ছিল তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এই মহল্লাগুলোতে প্রথম দিকে শওকত ভাইকে সাথে নিয়েই আমরা পোষ্টার লাগাতাম, বিলি করতাম প্রচারপত্র। স্ট্রিট কর্নার মিটিংও করেছি অনেক। কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি। বরং স্থানীয় জনসাধারণ নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। প্রচারপত্র ছাপানোর জন্য চাঁদা পর্যন্ত দিয়েছেন। এদের সমর্থনের ফলে আমরা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই কথা সত্য, গোড়ার দিকে নানারকম প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম ঢাকার স্থানীয় জনসাধারণ ছাত্রদের পক্ষে আসতে শুরু করেছেন আমাদের মনোবল তখনই প্রচণ্ডভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠল। (ঐতিহ্য : *মহান ভাষা আন্দোলন স্মারক*, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬, মো. লুৎফল হক)

ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অপরাধে শওকত আলী ২রা মার্চ ১৯৫২ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং বহুদিন জেলে আটক ছিলেন। (সূত্র: *সাপ্তাহিক সৈনিক* ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। পরবর্তীকালে জাতীয় ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সঙ্গে শওকত আলীকে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়।

লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে পরোপকারী এই মানুষটি আজীবন সাধারণ মানুষের পাশে থেকে রাজনীতি করে গেছেন। বড়ো পদ বা ক্ষমতার জন্য তিনি রাজনীতি করেননি। জীবনে অনেক বড়ো বড়ো প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বর্তমান রাজনীতিতে ভাষা সৈনিক শওকত আলীর মতো নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, আদর্শিক নেতার বড়ই অভাব। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ– বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে শওকত আলীর নাম। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, নানা কারণে যেসব ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের অবদান ও সীমাহীন আত্মত্যাগ আড়ালে পড়ে গেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন শওকত আলী। আজকাল তো ইতিহাস চর্চাও লাভালাভের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিক থেকে শওকত আলীর নাম উচ্চারণে দুই পয়সার লাভ নেই জেনেই হয়ত কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে লেখে না বা খোঁজ নেয় না। মহান এই ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের জন্ম, মৃত্যু কিংবা কর্ম তাই আলোচনার আড়ালেই থেকে যায়। প্রচারের অভাবে দেশ ও জাতির জন্য শওকত আলীর অপরিসীম আত্মত্যাগ ও অবদানের কথা তাই তরুণ প্রজন্মের কাছেও অজানা রয়ে গেছে। হাতে গোনা কয়েকজন লেখক যারা আমার বাবা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় লিখেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সন্তান হিসেবে আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে দেশ ও রাজনীতিতে আমার বাবা শওকত আলীর অবদানের কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল- দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। যাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সাহসিকতায় সেদিন ভাষা আন্দোলন সফলতা লাভ করেছিল, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভাষা আন্দোলনের চেতনার সন্দীপনে বাঙালি জাতি যখন মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে লিপ্ত তখনও বর্ষীয়ান ভাষা সংগ্রামী শওকত আলী একই প্রত্যয়ে ও উদ্দীপনায় সে সংগ্রামে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। ১৯৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আশ্রয়স্থল ছিল শওকত আলীর বাড়িটি। ঐ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন বৈঠকসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হতো খুবই সতর্কতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে। শওকত আলী তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। কয়েকবার এই বাড়িটি পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা একাধিকবার শওকত আলীকে হত্যার অপচেষ্টা চালায় এবং ব্যর্থ হয়।

মহান এই ভাষা সৈনিক ১৯৭৫ সালের ১৮ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষা আন্দোলনে শওকত আলীর কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবময় অবদানের জন্য ২০১১ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ঢাকা সিটি করপোরেশন ২০১০ সালে জাতির এই গর্বিত সন্তানের নামে ধানমন্ডিস্থ ৪/এ সড়কটির নামকরণ করে।

মহিউদ্দিন আল আমান শাহেদ: ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শওকত আলীর সন্তান

বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে করণীয়

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

বাংলা বিশ্বের ৩০ কোটির অধিক মানুষের মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষা। এককালের 'ভাবের ভাষা' একালের কাজের ভাষাও বটে। বাংলাদেশের সরকারি অফিস-আদালত, বেসরকারি অফিস, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলো, সব পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, মননজীবী সবাই তাদের ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মজীবনে নানাভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দ, সুখ ও গর্বের বিষয়। কেননা, ভাষা স্থবির নয়, বরং গতিশীল, তা প্রবহমান নদীর মতো দুকূল ছাপিয়ে চলে উত্তম গতিতে। পথে নানা স্থান থেকে সংগৃহীত হয় নানা উপকরণ যা ভাষাকে সতত সমৃদ্ধ করে চলে। তাই ভাষার বহুমাত্রিকতা ও কলেবর ক্রমাগত বেড়েই চলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কালের পর কাল। যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধিশালী হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় নতুন আঙ্গিক ও অবয়বে।

একটি ভাষা তখনই সামগ্রিকভাবে পঠন-পাঠনের উপযোগী হয়ে ওঠে, যখন ভাষাটির একটি প্রমিত লিখন রূপের বিকাশ ঘটে। মূলত এই লিখিত রূপের মাধ্যমে ওই ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপায়ণটিও সমৃদ্ধ হয়। আর ভাষাটির শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি একে কাজের ভাষায় পরিণতও করতে হয়। অর্থাৎ শুধু সাহিত্য, কলা বা সংস্কৃতি প্রকাশের বাহন হিসেবেই নয়, বরং অর্থনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি সব বিষয় সম্পর্কিত ভাবের প্রকাশ রূপেও এটিকে সমর্থ হয়ে উঠতে হয়। বাংলা ভাষা বিভিন্ন বিষয়ের লেখ্যরূপ প্রকাশের উপযোগী মাধ্যম হিসেবে গড়ে না ওঠার ক্ষেত্রে ভাষা হিসেবে এর অবয়বগত সীমাবদ্ধতা যত না দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যবাহী ব্যক্তিমানুষের ঔপনিবেশিক মানসিকতা। 'ব্যক্তিমানুষ' বলতে এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, নীতিনির্ধারক সবাইকে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি প্রকৃত আবেগ, ভালোবাসা ও দরদ থাকলে নিজের ভাষার সীমাবদ্ধতাকে দূর করার জন্য নানারকম অবয়ব পরিকল্পনা অনায়াসেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আর সরকারি প্রণোদনা এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

অতীতে বাংলা বিভাগের অধীনে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও সাম্প্রতিক এ বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স হ্রাস করার কারণে বাংলা বিভাগে বাংলা ভাষাবিষয়ক উচ্চতর গবেষণা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এসেছে। তাই এ ধরনের সুযোগ এখন শুধু ভাষাবিজ্ঞান বিভাগেই বর্তমান রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করার সুযোগ লাভ করে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চালুকৃত ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক কোর্সে বাংলা ভাষার উপাদানগুলোর সাংগঠনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কৌশলগুলো আয়ত্ত করে নিতে পারে। একমাত্র বাংলা বিভাগেই বিশুদ্ধ অর্থে কথ্য এবং লেখ্য মাধ্যমরূপে বাংলা ব্যবহৃত হয়। বিষয়টি যৌক্তিকও বটে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার অন্তরালে নিহিত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা এবং সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রূপ ও রসকে উন্মোচিত করা, যাতে করে এ ভাষার সম্ভাবনাকে সবাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। তবে কলা অনুষদে ইংরেজি ব্যতিরেকে অন্য বিভাগগুলোতে শ্রেণিকক্ষে

বাংলা ব্যবহৃত হলেও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে এর মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার উত্তরপত্রে বাংলা বা ইংরেজি যে-কোনো একটিতে উত্তর দিতে পারে, যদিও সম্প্রতি কোনো কোনো বিভাগ পরীক্ষার লিখন মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকে বাংলা বিভাগ ছাড়া কলা অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদের বিভাগগুলোর শিক্ষার মাধ্যম ছিল মূলত ইংরেজি। তবে এই ধারাটির বিপরীতে বাংলার পক্ষে হাওয়া বইতে শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধার সময় থেকেই। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে এক নতুন উদ্দীপনা স্ফুরিত হয়, যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিভাগই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার প্রেরণা লাভ করে। বিশেষ করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বশবর্তী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে তখন শ্রেণিকক্ষের ভাষারূপ যেমন নির্ভেজাল বাংলা ছিল, তেমনিভাবে উত্তরপত্রের লেখ্যরূপ হিসেবে তখন দ্বি-ভাষারীতি চালু ছিল। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী তখন ইংরেজি বা বাংলা যে-কোনো একটি রীতিতে পরীক্ষার খাতায় উত্তর প্রদান করতে পারত। তাতে করে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। কেননা, উত্তরপত্রের ভাষারীতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দক্রমের একটা স্বাধীনতা ছিল, যা একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার এই অগ্রগমন স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক বছর বর্তমান থাকলেও বিশ্বায়নের প্রভাবে নব্বইয়ের দশকে এসে তা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলা বিভাগ ছাড়া কলা অনুষদের অন্যান্য বিভাগ, আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলো তাদের শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের লেখার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজিতে প্রত্যাবর্তন করে। বাংলাদেশের একাডেমিয়াতে ইংরেজির এই প্রত্যাবর্তনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি দুশো বছর ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রাজত্ব করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক ভাষার প্রসঙ্গে প্রথমেই এদেশবাসীর মনোচেতনায় জ্বলজ্বল করে বিরাজমান ইংরেজির কথাই মনে আসে। এর পাশাপাশি আরেকটি কারণও এক্ষেত্রে বেশ প্রকট, সেটি হচ্ছে বৈশ্বিক একাডেমিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির বিশালতা ও বৈভব। তবে ইংরেজির কারণে আমাদের বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ ইতিহাস ম্লান হতে পারে তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা আমাদের জন্য আদৌ কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি তাদের সারাজীবন এক ধরনের সহানুভূতি থেকে যায়। সে কারণে নিজ দেশেও তারা ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এই অবস্থা বিরাজমান। ঐতিহ্যগতভাবে সাবেক ব্রিটিশ কলোনি হওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংরেজিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই তাদের পছন্দের শীর্ষে স্থান দিয়ে থাকে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপন শেষে দেশে ফেরার পর ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠা করতে তারা তৎপরতা দেখায়। সেই সঙ্গে বিশ্বায়ন পর্ব তাদের এই তৎপরতায় নতুন করে ঘি ঢেলে দিয়েছে। যাই ঘটুক না কেন আমরা মানসিকভাবে তৎপর হলে এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সুন্দর হলে বাংলা ভাষাতেই সাধারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি– সব শিক্ষার যথার্থ বাহন করে তোলা সম্ভব এবং একদিন এই বাংলা ভাষাই আন্তর্জাতিক বিশ্বে পঠন-পাঠন উপযোগিতা লাভ করে বিশ্বের ভাষা তালিকার অবস্থানকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি একে অন্যে মিলেমিশে পারস্পরিক মেলবন্ধ ও বৈশ্বিক সংস্কৃতি প্ল্যাটফর্ম রচনা করে বিশ্বজনীনতা লাভ করবে– এটাই তো যুগের হাওয়া। এই যুগের হাওয়ার বিরুদ্ধাচরণ কোনো সুবিধা বয়ে আনবে না। অন্য কোনো ভাষা বা সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমাদের স্বকীয়তা যেন নষ্ট না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার নজর দিতে হবে। প্রয়োজনে ভাষার উন্নয়নে এবং রক্ষণাবেক্ষণে সঠিক ভাষানীতির প্রবর্তন করে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে। বাংলা বানান নিয়ে বর্তমান সমস্যার অন্ত নেই। বাংলাদেশেও এ সমস্যা প্রকট বলে অনেকের ধারণা। একই শব্দের বিভিন্ন বানান লেখা হচ্ছে যত্রতত্র। সাহিত্য ছাড়াও পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে, সংবাদপত্রে, সাময়িকীতে, বেতার-টেলিভিশনে এই ভুলের ছড়াছড়ি অনেকের চোখে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে বাদ পড়ে না অফিস-আদালতে ব্যবহৃত লিখিত চিঠিপত্রে, নোট, সারাংশ, প্রতিবেদনে, সভা-সমিতির কার্যপত্রে ও কার্যবিবরণীতে অশুদ্ধ বানানের বিপুল সমাহার। আমরা বাংলাদেশি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলায় আমরা কথা বলি, আমাদের কথা বলাটা কতটা শুদ্ধ ও সঠিকভাবে করছি তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি। অথচ আমরা তো ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মান লাভ করেছে। বাংলা ভাষার ইতিহাস অনেক গর্ব ও গৌরবের। তাই বাংলা ভাষায় শুদ্ধ কথপোকথন ও বাংলা শুদ্ধ রীতির আচারে আমাদের বিশ্বাসী হতে হবে। কিন্তু আমরা তার প্রায়োগিক দিক থেকে অনেকটা দায়সারা আচরণে অভ্যস্ত।

নিজের ভাষার প্রতি দৈন্যদশা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। ভাষার গর্ব ও গৌরব যেন কোনো অবস্থাতেই ম্লান না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং একমাত্র মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে আমরা আগামী দিনের একটা সুন্দর, সফল ও মর্যাদাবান জাতিতে পরিণত হতে পারব।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ: লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট

দাপ্তরিক পত্রে ভাষাগত ত্রুটি: বিদ্যমান বাস্তবতা ও করণীয়

মো. মামুন অর রশিদ

মানুষ যেমন কথা বলে, তেমনি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরও কথা বলে। অনেকের মনেই প্রশ্ন আসবে কীভাবে দপ্তর কথা বলে? সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহ লিখিত ভাষায় কথা বলে। এই লিখিত ভাষায় কথা বলার বহুলপ্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মাধ্যম হলো 'পত্র'। পত্রের মাধ্যমেই কোনো দপ্তরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি, চাহিদা, ক্ষোভ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। দাপ্তরিক পত্রে সাহিত্যরস নেই বললেই চলে। দাপ্তরিক পত্রে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে এবং কীভাবে ব্যবহৃত হবে– এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে।

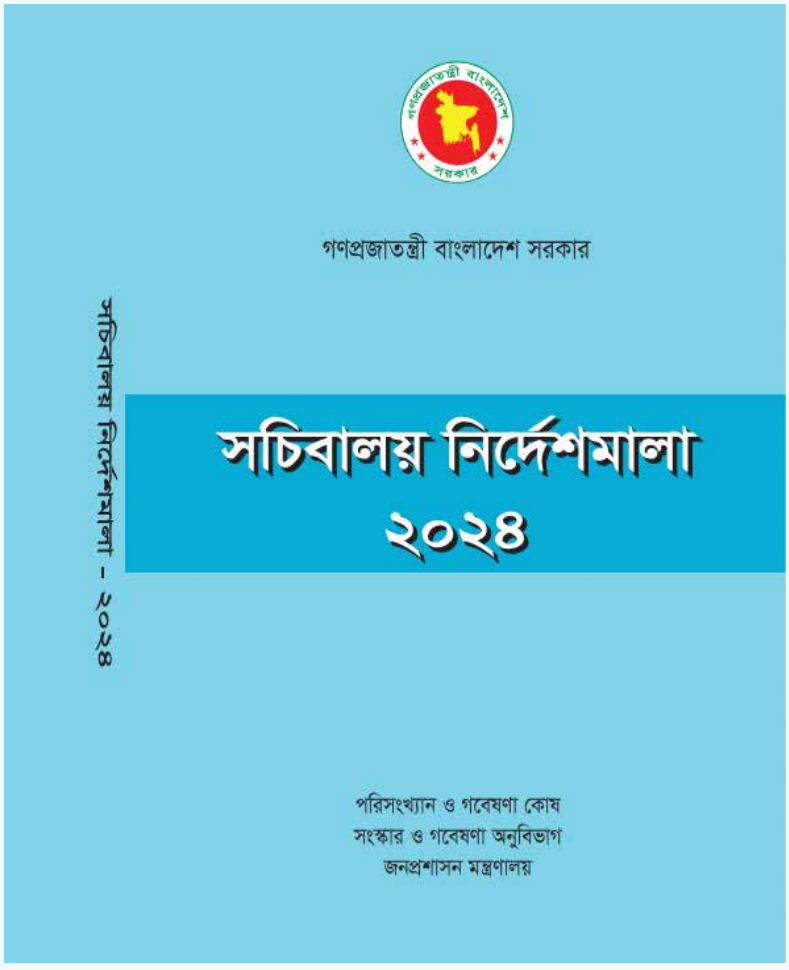

'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' অনুযায়ী, বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতাকে আমলে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর 'সরকারি কাজে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ'-সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করে। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণের মাধ্যমে সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এ পরিপত্র দ্বারা সরকারি কাজে সর্বত্র বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ পরিপত্রের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ *সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা* পুস্তিকা প্রকাশ করে। এ পুস্তিকা প্রকাশের পর বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ লিখনরীতির নির্দেশিকা হিসেবে *সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম* পুস্তিকা প্রকাশ করে (প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৭)। এ পুস্তিকায় বানানরীতি ও লিখনরীতি সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি সরকারি কাজে বহুলব্যবহৃত শব্দের শুদ্ধ রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, দাপ্তরিক যোগাযোগ তথা সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি এ ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সরকারি কাজে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। দাপ্তরিক পত্রে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও ভুল বানানের ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে দাপ্তরিক পত্র মুহূর্তেই একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে যাচ্ছে। একইসঙ্গে পত্রের ব্যাকরণগত ভুল ও অশুদ্ধ বানান বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী দাপ্তরিক পত্রের ব্যাকরণগত ভুল ও অশুদ্ধ বানানকে শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করছেন। ভুলে ভরা দাপ্তরিক পত্রের কারণে বাংলা ভুল বানান ও অপপ্রয়োগ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। যার ফলে দাপ্তরিক পত্রের মাধ্যমে একদিকে মাতৃভাষা বাংলাকে অমর্যাদা করা হচ্ছে, অন্যদিকে অশুদ্ধ বাংলা বানান ও অপপ্রয়োগকে প্রচার করা হচ্ছে।

দাপ্তরিক যোগাযোগে বহুলপ্রচলিত ভাষাগত কয়েকটি ভুল দেখে নেওয়া যাক। দাপ্তরিক পত্রে বহুলব্যবহৃত একটি শব্দ হলো

'অনুষ্ঠিতব্য'। বহুলব্যবহৃত হলেও শব্দটি অশুদ্ধ। 'ভবিষ্যতে কোনো কিছু করা হবে' অর্থ প্রকাশে 'অনুষ্ঠিতব্য' না লিখে 'অনুষ্ঠেয়' বা 'অনুষ্ঠাতব্য' লিখতে হবে। অনেকেই 'এই' বা 'এ' অর্থ প্রকাশে 'অদ্র' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'অদ্র' অর্থ এখানে বা এই স্থানে। 'অত্র' শব্দটি কখনো 'এই' বা 'এ' অর্থ প্রকাশ করে না। আবার একই ব্যক্তির নামের পূর্বে 'জনাব' ও পরে 'মহোদয়' লেখাও সমীচীন নয়। 'জনাব' ও 'মহোদয়' সমার্থক শব্দ। তাই 'জনাব' বা 'মহোদয়' যে-কোনো একটি ব্যবহার করতে হবে। 'আওতাধীন', 'আয়ত্তাধীন', 'অধীনস্থ', 'সবিনয়পূর্বক', 'শুধুমাত্র', 'সময়কাল' প্রভৃতি শব্দ দাপ্তরিক যোগাযোগে বহুলপ্রচলিত হলেও অশুদ্ধ। 'আওতাধীন'-এর পরিবর্তে 'আওতায়' বা 'অধীন' ব্যবহার করা যেতে পারে। 'আয়ত্তাধীন' ও 'অধীনস্থ'-এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'অধীন'। 'সবিনয়পূর্বক' না লিখে 'সবিনয়' বা 'বিনয়পূর্বক'– যে-কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা যাবে। 'শুধুমাত্র'-এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'শুধু' বা 'মাত্র'। অনুরূপভাবে 'সময়কাল'-এর পরিবর্তে লিখতে হবে 'সময়' বা 'কাল'।

'প্রেরণ করতে হবে'– এমন অর্থ বুঝাতে অনেকে 'প্রেরিতব্য' লিখে থাকেন। এটি ভুল। 'প্রেরণ করতে হবে' কিংবা 'পাঠানোর যোগ্য' অর্থ প্রকাশে 'প্রেরণীয়' লিখতে হবে। আবার অনেক পত্রে একই বাক্যে 'জনিত' ও 'কারণ' শব্দ দুটি পরপর লেখা হয়। 'জনিত' ও 'কারণ' সমার্থক শব্দ। তাই, 'জনিত' লিখলে 'কারণ' লেখার প্রয়োজন নেই। যেমন: 'সংক্রমণজনিত কারণে' না লিখে 'সংক্রমণের কারণে' লিখতে হবে। অনেকে আবার পদবির মাঝখানে 'মহোদয়' লিখে থাকেন। যেমন: 'উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব', 'সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব' প্রভৃতি। শুদ্ধ হলো 'উপদেষ্টার একান্ত সচিব', 'সচিবের একান্ত সচিব'। দাপ্তরিক যোগাযোগে অনেকে তারিখের শেষে 'ইং' লিখে থাকেন। 'ইং' না লিখে 'খ্রিষ্টাব্দ' বা 'খ্রি.' লিখতে হবে। আবার কেউ কেউ সময় লিখতে একবিন্দু (.) ব্যবহার করেন। যেমন: সকাল ৯.০০ টা, বিকাল ৫.২০ মি.। মান্য রীতি হলো: সকাল ৯:০০ টা, বিকাল ৫:২০ মি.।

শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণ জানাতে 'স্বাগতম' শব্দটি বহুলপ্রচলিত ও জনপ্রিয়। বাস্তবতা হলো 'স্বাগতম' শব্দটি অশুদ্ধ। 'স্বাগতম'-এর শুদ্ধরূপ হলো 'স্বাগত'। চাওয়া হয়েছে এমন বুঝাতে অনেকে 'চাহিত' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'চাহিত' শব্দটি অশুদ্ধ। চাওয়া হয়েছে এমন বুঝাতে 'যাচিত' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

শব্দ সংক্ষিপ্তকরণে অনেকে বিসর্গ ব্যবহার করেন। শব্দ সংক্ষিপ্তকরণে বিসর্গের পরিবর্তে একবিন্দু (.) ব্যবহার করতে হবে। যেমন: 'ডাক্তার'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ডা.। বিসর্গ একটি বর্ণ। শব্দের শেষের বিসর্গের উচ্চারণ 'হ'। যেমন: কেউ যদি 'ডাক্তার'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে 'ডাঃ' লেখেন, তাহলে উচ্চারণ হবে 'ডাহ্'। আবার শব্দ সংক্ষিপ্তকরণে অনেকে কোলন (:) ব্যবহার করেন। এটিও অশুদ্ধ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক পত্রে বিষয়-এর শেষে 'প্রসঙ্গে' বা 'সংক্রান্ত' লেখা হয়। যেমন– 'বিষয়: নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন প্রসঙ্গে'; 'বিষয়: নৈতিকতা কমিটি গঠন-সংক্রান্ত' প্রভৃতি। 'বিষয়', 'প্রসঙ্গ' ও 'সংক্রান্ত' শব্দ তিনটি সমার্থক। ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক পত্রে বিষয়-এর শেষে নতুন করে 'প্রসঙ্গে' বা 'সংক্রান্ত' লেখা সমীচীন নয়। দাপ্তরিক পত্রে বহুলপ্রচলিত এ রকম হাজারো ভুল রয়েছে।

দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধ বাংলা চর্চা হচ্ছে না। আরেকটি কারণ হলো– বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব। দাপ্তরিক পত্র শুদ্ধভাবে লেখার চেষ্টা করেন– এ রকম ব্যক্তির সংখ্যাও অনেক কম। দাপ্তরিক পত্র লেখার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের পূর্বসূরিকে অনুসরণ করেন; কিন্তু অভিধান দেখেন না। এর ফলে দাপ্তরিক পত্রে পূর্বসূরিদের ভুল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে এবং নতুন করে কিছু ভুল যুক্ত হচ্ছে। এ কারণে দাপ্তরিক পত্রে ভুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দাপ্তরিক যোগাযোগে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিকতা। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি আন্তরিকতা নিয়ে শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে পারবেন। এর জন্য তাকে কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত, হাতের কাছে বাংলা একাডেমির অভিধান রাখতে হবে। কোনো শব্দের বানানে সংশয় থাকলে অভিধান দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা বানান শুদ্ধভাবে লেখার জন্য বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, যতিচিহ্ন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ বাক্যে যতিচিহ্নের হেরফের অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করে। চতুর্থ, সরকারি দপ্তরের পত্র লেখার সময় সরকার-নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া শুদ্ধভাবে পত্র লেখার ক্ষেত্রে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০২৪-এ বর্ণিত পত্রসংক্রান্ত নির্দেশনাও অনুসরণ করতে হবে।

বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চার অন্যতম ক্ষেত্র হলো দাপ্তরিক যোগাযোগ। এই দাপ্তরিক যোগাযোগে রাতারাতি বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য দপ্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাষাসংক্রান্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় দাপ্তরিক যোগাযোগে বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ নিশ্চিত হবে– এমনটাই প্রত্যাশা।

মো. মামুন অর রশিদ: জনসংযোগ কর্মকর্তা পদে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কর্মরত

[সৌজন্যে: পিআইডি ফিচার]

সংস্কৃতি ও সদাচার

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃতি ও সদাচার শব্দ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুস্থধারার সংস্কৃতি ও সদাচার যারা চিত্তে লালন করেন তাদের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ চাঁদের আলোর মতো আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংস্কৃতি ও সদাচারের উন্নয়ন আবশ্যক।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চলাচল ধ্রুপদী ধারায় বহমান থাকে– যা দিয়ে অন্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়, সেটাই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যে ভাষায় কথা বলে, যে রকম আচার-আচরণ বা ব্যবহার করে, যে-রকম পোশাক-পরিচ্ছদ পরে, যেভাবে খাওয়াদাওয়া পরিবেশন এবং আহার করে, যে-রূপভাবে শিক্ষাগ্রহণ বা দান করে এসব মিলিয়ে একটা মানুষ যেভাবে তাকে প্রকাশ করে সেটাই তার সংস্কৃতি। একটা জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, খাদ্য, কথা বলা, বাচনভঙ্গি এবং শিল্পকর্ম নিয়ে এগিয়ে চলাই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, অবস্থান, রুচি, শিল্পচর্চা প্রভৃতি সবকিছুর সংমিশ্রণ হচ্ছে সংস্কৃতি।

সঠিক আচরণ, সৎ আচরণ, সদাচার মানুষের একটা বিশেষ গুণ। বলা হয়ে থাকে– ব্যবহারেই বংশের পরিচয়। ভালো ব্যবহার সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দর কথাবার্তা, আদবকায়দা সব মানুষই প্রত্যাশা করে। এমনকি যে মানুষটি ভালো ব্যবহার করতে জানে না, কিন্তু সে নিজের ব্যবহার সংশোধন করতে না পারলেও অন্যের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশা করে। মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসার নিমিত্তে যেসব আচরণ করা হয় সেটাই সদাচার। যে আচরণের মধ্য দিয়ে অপরের ক্ষতি হবে না। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যতা থাকবে এবং উত্তম আচরণ বজায় থাকবে সেটাই সদাচার। যেমন: ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দেশপ্রেম, শ্রদ্ধা, সম্মান, সমাজসেবা প্রভৃতির সমন্বয় হলো সদাচার।

সংস্কৃতি সমাজে ব্যাপকতা সৃষ্টি করে। সমাজ সুস্থধারার সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়। ব্যক্তির সমষ্টিগত আচরণই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই প্রভাবিত। সমাজের চালিকাশক্তি হচ্ছে সংস্কৃতি। একটা সমাজে যত মানুষ আছে সবাই এই চালিকাশক্তির ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে তার জীবন অতিবাহিত করে। সেই হিসেবে সমাজ ও ব্যক্তি একইসূত্রে গ্রথিত। সমাজ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সংস্কৃতি-ব্যক্তি-সমাজ এই শব্দগুলো পরিপূরক বা সম্পূরক। অর্থাৎ সমন্বয় ধারায় চলে। ব্যক্তি ব্যতীত সমাজের কোনো প্রশ্ন আসে না। তাইতো সমাজ ও ব্যক্তি পরিপূরক। সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ অলোকিত হয়।

ব্যক্তির সঙ্গে সদাচার বজায় থাকবে এটা সবাই আশা করে। সমাজের সুস্থতার জন্য সদাচার অপরিহার্য। সদাচার পেলে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। তাইতো ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সদাচারের সম্পর্ক নিবিড়। সদাচারবিহীন কোনো সমাজ সুশৃংঙ্খলভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা গড়ে ওঠে না। কথার মধ্যে মাধুর্য এবং শিষ্টাচার না থাকলে সমাজের ভালো সূচকগুলো পিছিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে সূচকগুলো– সমন্বিত কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি, সমাজের মানুষের পুষ্টি বিধান, সুপেয় ও নিরাপদ পানি, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, গড় আয়ু বৃদ্ধি প্রভৃতি। ব্যক্তি ও সমাজ যেহেতু একে অপরের পরিপূরক তাই এই ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংস্কৃতি প্রবহমান নদীর মতো। এটা আবদ্ধ নয়। সংস্কৃতির বাঁক পরিবর্তন হয়। ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিকাশ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সুন্দর মনের অধিকারী হয়, যদি একে-অপরকে বন্ধুত্বের ভাবনায় মেনে নেয়, তখনই সমাজে প্রাথমিক জাগরণ ঘটে। এই জাগরণের মাধ্যমে সবাই যদি একযোগে কাজ করে তাহলে সমাজের অনুষঙ্গগুলো বিকশিত হয়। তাহলেই সমাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলে। যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মাধ্যমে সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিকাশ ব্যাপকভাবে ঘটে। সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই ভালো কাজের মাধ্যমে সমাজের রূপান্তর ঘটে ও তার বিকাশ লাভ হয়। সংস্কৃতিচর্চা ব্যক্তি থেকে সমাজে বিস্তার হয়। এভাবেই সমাজের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির সুস্থ বিস্তার ঘটে।

বাংলাদেশের মধ্যে বহু জাতিগোষ্ঠী আছে। যার ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রভাবও রয়েছে। বিভিন্ন আন্দোলনে অর্থাৎ ১৯৫২-১৯৬২-১৯৬৬-১৯৬৯-১৯৭১ সালে জাতিসত্তার কতগুলো প্রণিধান সৃষ্টি হয়েছিল। সেসমস্ত আন্দোলনের মাধ্যমে জাতি গণতন্ত্রের একটা রূপরেখা পেয়েছে। বাঙালির হাজার বছরের প্রচলিত আচার বা রীতিনীতি বাঙালির কৃষ্টির মূল রূপরেখা। প্রত্যেকটা ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং চিন্তাভাবনার গভীরতা সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে এবং রাজনীতিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে সংস্কৃতির রূপরেখা গীত-বাদ্য-নৃত্য- লোককাহিনি-ভাষা- সাহিত্য-দর্শন-ধর্ম- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-বন্ধ শিল্প-ঐতিহ্য এসব কিছুর সমন্বিত রূপ। এসবসহ সকল সম্প্রদায়ের উৎসব উদ্‌যাপন হয়।

প্রযুক্তির ভালো ও খারাপ দুটো দিকই রয়েছে। তাই দুভাগ পরিলক্ষিত হয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেও হয়। যার ফলে বিশ্বায়নের যুগে এটা থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথও নেই। এটার জন্যে বাঙালি সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাবও পড়ছে। সামাজিক ন্যায়বিচারেও তার প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীর তথ্য এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। শক্তিশালী ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে চলে যাওয়া যায় পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ লাইব্রেরিতে। চেয়ার-টেবিলে বসেই পৃথিবীর তথ্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারের জগতে মুহূর্তেই প্রবেশ করা সম্ভব। ইন্টারনেটেরও খারাপ জগৎ রয়েছে। ঐ খারাপ সাইটটি মানুষের জন্য বিশেষ করে শিশুদের জন্য ভয়ংকর। সুতরাং বুঝে নিতে হবে এই খারাপ সাইটটিতে শিশুরা যেন প্রবেশ করতে না পারে। বিশেষ করে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং প্রযুক্তির আশীর্বাদের দিকটি শিশু-কিশোরদের বোঝাতে হবে। সকলে জানি শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-শিক্ষানীতি-রাজনীতি, ব্যাংক, ব্যাবসা ও সমাজের অন্যান্য রীতিনীতিসমূহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। আজকাল চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর। সুতরাং প্রযুক্তি ছাড়া সমাজ জীবন অচল। প্রযুক্তিনির্ভর সব কর্মকাণ্ডকেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই। সুতরাং সমাজ প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কৃতি পরস্পর হাত ধরে চলবে। সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিচর্চা

বেগবান হবে। অপসংস্কৃতি বর্জন করে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার দায়িত্ব রয়েছে সকলের।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ পল্লিগ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নদীমাতৃক। কোমলতা, সহনশীলতার সব গুণগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। তারা অল্পতেই খুশি। গ্রামীণসমাজে প্রকৃতির অবদানে মাটির উর্বরতাও রয়েছে। পল্লিসমাজে সদাচার যদি ঠিকভাবে বজায় থাকে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। সদাচার বিদ্যমান থাকলে অগ্রগতি তরান্বিত হবে। সুতরাং এই নিরেট সত্যটি সংস্কৃতি জগতের প্রত্যেক পুরোধা ব্যক্তিকে বুঝতে হবে। পাশাপাশি সদাচারী বৈশিষ্ট্যগুলো প্রত্যেক সংস্কৃতিকর্মীর হৃদয়ে প্রবেশ করানো জরুরি। এই ধারা পুরোপুরি সকলকে হৃদয়ে লালন করতে হবে। তবেই সদাচারী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। সদাচারের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য যথার্থ কাজ করতে হবে। ইতঃপূর্বে সদাচার প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। সদাচারের সদ্ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে আরও সুফল পাওয়া যাবে।

মেলবন্ধনের মাধ্যমে অপসংস্কৃতি রুখতে পারলে এবং সকলের মধ্যে সুস্থধারার সংস্কৃতিচর্চা বিদ্যমান থাকলে এটার সুফল পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ও সদাচার ব্যতীত কোনো দেশ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশও এগিয়ে যেতে পারে না। সংস্কৃতি ও সদাচারের মধ্যে সমন্বয় থাকলে প্রতিটি দেশ ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হলে আবাসযোগ্য স্বদেশ ও বিশ্ব নির্মাণে সংস্কৃতি ও সদাচারের সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং সংস্কৃতি ও সদাচারের ভূমিকা ব্যাপক রয়েছে। স্বদেশ ও বিশ্ব আবাসযোগ্য করতে সুস্থধারার সংস্কৃতিচর্চাকে বেগবান করতে হলে সকলকে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি সদাচারের মাধ্যমে মানবিক মানুষ গড়ে তোলার জন্য সকলকে সক্রিয় হতে হবে। যথাযথ আবাস গঠনে স্বদেশ ও বিশ্ব নির্মাণে সংস্কৃতি ও সদাচারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে রূপান্তর করতে হবে। সংস্কৃতি ও সদাচার বিষয় দুটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। যে জাতি সংস্কৃতি ও সদাচার আপন বৈশিষ্ট্য উন্নতির ধারা ও মানবিক বিকাশের স্থানটি ধরতে না পারে, সেই জাতি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। সুতরাং সংস্কৃতি ও সদাচার নিয়ে একটা বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি গৃহে যেন এর সুবাতাস পৌঁছে যায়। এটাই আশাবাদ। সংস্কৃতি ও সদাচারের উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা এবং সদাচারের বাস্তবায়ন জরুরি। সুস্থধারার সংস্কৃতিচর্চা ও সদাচারের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে। এটাই প্রত্যাশা।

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য: লেখক ও নজরুল গবেষক
pijushsharmistha@gmail.com

সুন্দরবনে প্রথমবার ভাষা দিবস পালিত

বঙ্গোপসাগর পাড়ে সুন্দরবনে দুর্গম দ্বীপ দুবলার চরের আলোরকোলে শুঁটকি জেলেপল্লিতে এবারই প্রথম যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দিবাগত রাতে একুশের প্রথম প্রহরে দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপ, বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠনের জেলে-মহাজনসহ বনবিভাগের কর্মকর্তা ও বনরক্ষীরা ককসিট দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী শহিদমিনারের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অস্থায়ী শহিদমিনারে ফুল দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ছাড়াও দিবসটি সুন্দরবনের আলোরকোলে দুই দিনব্যাপী হচ্ছে নানা অনুষ্ঠান। সুন্দরবন বনবিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সুন্দরবনের দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দিন আহমেদ জানান, লোকালয় থেকে শত শত কিলোমিটার দূর থেকে বঙ্গোপসাগর তীরের সুন্দরবনের জনবিচ্ছিন্ন চরে পেশার তাগিদে শীত মৌসুমে হাজার হাজার মানুষ অবস্থান করেন। মন চাইলেও বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে তারা অংশ নিতে পারেন না। তাই এবার তাদের সেই ইচ্ছাপূরণ এবং একুশের চেতনার আকাঙ্ক্ষা থেকে ভাষা দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সুন্দরবনের পাঁচটি চর নিয়ে গঠিত দুবলার চরের অস্থায়ী শুঁটকি জেলেপল্লিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলারচর শুঁটকি পল্লির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খলিলুর রহমান জানান, দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপের উদ্যোগে এ প্রথমবার সুন্দরবনে মর্যাদায় মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। সুন্দরবনের দুর্গম সাগরদ্বীপে জেলে-মহাজনরা দুই দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

একুশের অগ্নিস্মৃতি

হাসান হাফিজ

বর্ণমালা এখনো রক্তের দাগ তোমার শরীরে
রক্তরঙই লাবণ্য ও অহং তোমার
এত ক্রোধ তোমার নিভৃত বুকে
এত দ্রোহ এতটা বারুদ
কীভাবে সঞ্চিত ছিল অগ্নিবীজ এত
বোঝবার উপায় ছিল না–
আপাতনিরীহ শান্ত নির্বিরোধ
স্বভাব তোমার ছিল–
আঘাতে জাগ্রত হলে অনশ্বর রুদ্রতাপে
জ্বলে উঠলে দুর্বাসার মতো

যখনই আক্রান্ত হই
শত্রুর বিরুদ্ধে আমি, আমরা এই বঞ্চিতেরা
স্বাভাবিক নিয়মেই জ্বলে উঠতে জানি
সেই অগ্নি স্বতঃস্ফূর্ত, প্রকৃতিরই মতো সহজিয়া
স্বৈরাচার পুড়ে ভস্ম
অমন স্বপ্ন ও সাধ
শুধু এই ছোট জনপদে
কেন থাকবে সীমায়িত? খুলেছে অর্গল
মাতৃভাষা দিবসের রক্তঝরা অঙ্গীকার
গর্ব হোক বিশ্বমানবের
সানন্দ সম্পদ হোক বিশ্বমানবের।

এক সাহসী প্রবর

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

একুশের চেতনায় উজ্জীবিত আমার দেহ-মন।
জীবনের প্রতিটি কর্মকৌশলে যেন তার
মর্মবাণী আমাকে এগিয়ে নেয় সম্মুখ পানে এবং
পৌঁছায় সাফল্যের দোরগোড়ায়।
এজন্যেই আজ আমি বাংলা কবিতা লেখায়
উৎসাহিত হই, কলম হাতে নিই, মনের গভীরে
অনুচ্চারিত তাগিদ অনুভব করি।

সেই দিন যদি একুশে না হতো তাহলে আজ আর
বাংলা কবিতা কিংবা গল্প, ফিচার লেখার অনুষঙ্গ
খুঁজে পেতাম না অনুভূতি অনুভবে।
তাইতো নির্দ্বিধায় বলতে চাই–
একুশে আমার জীবনে পথচলার সঙ্গী এবং
এক সাহসী প্রবর।

ছেলের মতো হাসে

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

আমার ভায়ের রক্তে রাঙা
ফেব্রুয়ারি এলে
কী যেন মা খুঁজতে থাকে
চোখের পাতা মেলে!

উদাস করা চোখের পাতে
ঘুম আসে না নিঝুম রাতে–
পুত্রহারা ব্যথায় দেখি
মায়ের চোখে জল
ফেব্রুয়ারি মাস কি তবে
অশ্রু ছলাৎছল?

বাংলা ভাষার দাবি তুলে
ভয়-পিছুটান সকল ভুলে–
মায়ের ছেলে সেই যে গেল
আর ফেরেনি ঘরে
ফেব্রুয়ারি মাস এলে তাই
মা যে কেমন করে!

অশ্রুভরা চোখের কিনার
তাকিয়ে দেখি শহিদমিনার–
ঐ মিনারের স্তম্ভগুলোই
ছেলের মতো হাসে
তাই বুঝি মা শহিদমিনার
এত্তো ভালোবাসে!

বাংলা আমার মাতৃভাষা

আ. শ. ম. বাবর আলী

মাতৃভাষা আমার যদি বাংলাটা না হতো,
কেমনে গর্ব করতাম আমি এখন আমার মতো!
গর্ব করে কেমনে বলতাম– বরকত আমার ভাই?
রফিক-জব্বার-সালাম নিয়ে আমার গর্বটাই।

কত রকম কেচ্ছাকথা আমার ভাষায় আছে,
মধুমালার গল্প শুনি দাদি-নানির কাছে।
কাজলরেখা আয়নামতি আলাল-দুলাল কত,
হাজার রকম কেচ্ছা আছে আমার মনের মতো।

আমার ভাষার কৃষ্টি আছে কত রকম গান,
মিষ্টিমধুর সুরে যে তার যায় জুড়িয়ে প্রাণ।
মারফতি গান মুর্শিদি আর ভাটিয়ালি সারি,
ভাওয়াইয়া পালা জারির মজা ভুলতে কি আর পারি!

আব্বাসউদ্দিন আব্দুল আলীম কানাইশীলের মতো,
আমার ভাষার পল্লিগানের শিল্পী আছে কত।
আমার ভাষার প্রবাদ ছড়া ধাঁধা কত কী যে,
শিক্ষা তাতে লয় অন্যে– আমিও লই নিজে।

আমার ভাষার বিত্ত এমন অন্য ভাষায় নাই,
বাংলা আমার মাতৃভাষা– গর্ব আমার তাই!

বাংলা আমার ভাষা

খোরশেদ আলম নয়ন

বাংলা আমার ভাষা এবং
বাংলা আমার দেশ
নেই যে কোথাও অপূর্ব এ
মধুর সমাবেশ।

রক্ত দিয়ে কেনা ভাষা
রক্তে কেনা মাটি
কোথায় আছে স্বদেশ এমন
স্নিগ্ধ পরিপাটি।

বাংলা ভাষায় কথা বলি
জন্ম বাংলাদেশে
মরণ যেন হয় আবার এই
বাংলা ভালোবেসে।

বাংলা ভাষা বাংলাই দেশ
মানিকজোড়া নাম
এ দেশ নিয়ে তাই আমাদের
স্বপ্ন অবিরাম।

বাংলা ভাষা

আহসানুল হক

যেই ভাষাতে মাকে ডাকি
যেই ভাষাতে দেশকে আঁকি
গাই জীবনের গান...

যেই ভাষাতে খুশির জোয়ার
দিই খুলে দিই বুকের দুয়ার
জুড়াই হৃদয়-প্রাণ!

যেই ভাষাটা স্বপ্ন আঁকা
যেই ভাষাটা রক্তমাখা
বীর শহিদের দান...

সেই ভাষাটা 'বাংলা' ভাষা
কামার-কুমার, তাঁতি-চাষা
প্রকাশ করে ভালোবাসা
মায়ের প্রতি টান!

সেই ভাষাটা স্বাধীনতা
যুদ্ধ জয়ের কথকতা
বাংলাদেশের মান...

সেই ভাষাকে প্রণাম করি
সেই ভাষাকে কেবল স্মরি
হাওয়ায় পেতে কান!

মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষা শিখি,
এই ভাষাতে মনটা খুলে
গান-কবিতা লিখি।

বাংলা শিখি বাংলা লিখি
বাংলা পড়ি বই,
বাংলা দেখি বাংলা শুনি
বাংলা কথা কই।

দেশ-মাটি-মা সবকিছুতে
বাংলা মিশে আছে,
জন্ম থেকে বাংলা শেখা
বাংলা যেন বাঁচে।

আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে–/ ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,/ আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে'। গাছের নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঝরা পাতারা জানিয়ে দিচ্ছে যেমন প্রকৃতির রূপ বদলের কথা, শিমুল-পলাশ-অশোকসহ বিভিন্ন গাছের শাখায় রঙিন ফুলের সমাহার তেমনি জানান দিচ্ছে বসন্তের আগমনি বার্তা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রকৃতিতে লেগেছে তার ছোঁয়া। ধরা দিয়েছে ঋতুরাজের আগমন-উচ্ছ্বাস। কারণ প্রকৃতির বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য মানুষের মনেও নানা ভাবের প্রকাশ ঘটায়। বসন্ত বরণে তরুণ-তরুণীর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নতুনভাবে সেজেছে সারাদেশ। বসন্তে তরুণীদের খোঁপায় থাকে লাল-হলুদ ফুল, হাতে জড়ানো গাঁদা ফুল। বসন্ত প্রেমের ঋতু। ফাগুনে শুরু হয় ভালোবাসার গুনগুনানি। দখিনা উদাস হাওয়ায় প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে বইছে বাধভাঙা সৃষ্টির স্বপ্ন। আত্মার গহীনে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার কথা জানান দেয়। মূলত বসন্ত আসে নতুন পাতা, নতুন সময়, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসা ফুলের সুবাস জানান দেয়, বসন্ত ঋতুর রাজা। উদাস মন নেচে ওঠে দখিনা হাওয়ায়। সৌরভে ভরে যায় মন-প্রাণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেন– 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।/ বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা'।

শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ– সব বয়সি মানুষের ভেতর থেকেই উপচে পড়ছে বসন্তের আবহ। শুধু প্রকৃতি নয়, মানব মনও রঙিন হয়ে ওঠে। বসন্তের রং, রূপ, রস ও লাবণ্য– সব রয়েছে। আছে মাতাল দখিনা সমীরণ। ফাগুন শুধু প্রকৃতিকেই প্রভাবিত করে না, আমাদের মানব হৃদয়কে করে উজ্জীবিত। ফাগুন মানব মনে ভাব জাগায়। চির সবুজের ভাব। তারুণ্যের ভাব। বসন্ত যৌবনের গান গায়। তাই শুধু প্রেমের তো নয়, বিদ্রোহেরও এই বসন্ত। বিদ্রোহের দীপাবলি জ্বালায় সে পথে পথে। ফাগুনে বাঙালির দ্রোহপ্রেম আর দেশপ্রেমের অনন্য নজির রয়েছে। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এই বসন্তেই শুরু হয়েছিল। ভাষাশহিদদের রক্তের রং বাঙালি জাতিকে রঙিন করে। প্রেরণা জোগায় অধিকার আদায়ে। সংগ্রামে আত্মদানে প্রবুদ্ধ করে। বিজয়ী হতে শেখায়। আমরা আন্দোলনে-সংগ্রামে ফাগুনের তারুণ্যেই হই উদ্বেলিত। তাই তো আমাদের চিরায়ত অমোঘ বাণী– 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো'। ফাগুন বিদ্রোহের চেতনায় ধরিয়ে দেয় আগুন। তাই তো আমরা স্বাধিকার আদায়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে জ্বলে উঠি। ইতিহাসের হই অংশ। হই সংগ্রামী। হই আত্মত্যাগী। হই বিজয়ী। একুশের চেতনাই আমাদেরকে দেয় নিরন্তর প্রেরণা। এ প্রেরণা আমাদের অধিকার আদায়ে ২০২৪-এর জুলাইয়ের ছাত্র গণ-আন্দোলনে ছিল দারুণ ক্রিয়াশীল। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের এ গণ-আন্দোলন হয়েছে সার্থক। তৈরি হয়েছে নতুন ইতিহাস।

ফাগুন আমাদের সাংস্কৃতিক সংগ্রামের স্মারক। এই ফাগুনে আমরা মাতৃভাষা পেয়েছি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন এই ফাগুনকে করে তুলেছে ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। পলাশ-শিমুল ফোটার এই ফাগুন আমাদের ভাষাপ্রেমকে সংগ্রামী করে তুলেছে। আমরা দলে দলে কারাবরণ করেছি। সেটা ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। প্রকৃতি প্রেমের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ফাগুনে আমরা মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠি।

সরকারি বাধাকে উপেক্ষা করে অন্যায়কে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ দৃঢ়ভঙ্গিকে কেন্দ্র করে জহির রায়হান রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস *আরেক ফাল্গুন*। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে জহির রায়হান বলে গেছেন 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো'। তবে এই চিরন্তন উক্তিতে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন– দিনে দিনে অধিকার সচেতন মানুষের সংখ্যা বাড়বে এবং তাদের অধিকার আদায় করেই ছাড়বে।

জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের গল্প। ১৯৫৫– ভাষা আন্দোলনের বছর তিনেক পরের একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু শহিদ দিবস পালনে বাধ সাধে সরকার। ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় খালি পায়ে হেঁটে বেড়ায় শিক্ষার্থীরা। একুশে ফেব্রুয়ারি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু পুলিশি বাধায় আহত হয় শত শত শিক্ষার্থী। গ্রেপ্তার হয় অনেকে। ডেপুটি জেলার গ্রেপ্তারকৃতদের নাম ডাকতে ডাকতে বিরক্ত হয়ে বলে, 'জেলে তো এত জায়গা নাই, কোথায় জায়গা দেবে এত মানুষকে!' তখন আটকৃতদের একজন বলে, 'এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।' এই উক্তির মাধ্যমে জহির রায়হান

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে স্মরণ করিয়ে দেন, মানুষ জাগলে অত্যাচারীর দিন ফুরিয়ে আসে। এখানে আছে প্রেম এবং আছে দ্রোহ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার ভবিষ্যদ্বাণী এখানেই খুঁজে পাই। জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* অত্যচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক ব্যতিক্রমী উপন্যাস। বাংলার ছাত্রসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়ায় নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে তার এক অসাধারণ চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন দূরদর্শী সাহিত্যিক জহির রায়হান।

বাঙালির জাতীয় জীবনে ফাগুনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফাগুন আমাদের প্রতিবাদের চিরন্তন আগুন জ্বালিয়ে দেয়। একুশ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ভাষার দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। বীর বাঙালির অসম সাহসী ভূমিকা পালন করে তৈরি করেছে ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনের মিলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। একুশে বাঙালির বীরত্বগাথা, আত্মত্যাগ ও অর্জন যেমন চিরভাস্বর, তেমনি এই দাবি আদায়ের আন্দোলন বাঙালিকে করেছে অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদী। একুশ বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস। ফাগুনের একুশ শুধু বেদনাবহই নয়, অনুপ্রেরণাদাতাও। ফাগুন এলেই শীতের আড়মোড়া ভেঙে যেমন আমরা নতুন করে বসন্ত বাতাসে উদ্বেলিত হই, অনুপ্রাণিত হই, সজীব হই; ঠিক তেমনি ফাগুনে আমরা বিদ্রোহী চেতনার আগুনে উজ্জ্বল হই। তাই তো অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার দীক্ষা নিয়ে স্বাধিকার আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফাগুন আমাদের প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিরন্তর উৎস।

আন্দোলনের ভাষা হলো স্লোগান। তবে স্লোগান আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। মিছিল ও সমাবেশ থেকে স্লোগান জন্ম নেয়। হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতীক। তবে আন্দোলনে নানান

ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বদল আসে স্লোগানে। আন্দোলনে পরিস্থিতি যত বদলায়, তত যুক্ত হয় নতুন নতুন স্লোগান। কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে চাঙা রেখেছিল বিভিন্ন স্লোগান, যা উত্তাল সময়ে রাজপথে মানুষকে সাহস ও প্রেরণা দিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে এসব স্লোগান বারুদের মতো কাজ করে, জোগায় ঐক্যবদ্ধ

লড়াইয়ের প্রেরণা। এসব স্লোগানের গভীরতা ছাত্র-জনতার রক্তে বিস্ফোরিত হয়েছিল। এসব স্লোগান ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। উঠে আসে দেয়ালজুড়ে আঁকা গ্রাফিতিতে। 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'– এর মতো শ্লেষের প্রতিবাদ একপর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের এক দফা এক দাবিতে। 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'– এর মতো বজ্রকঠিন কিছু স্লোগান ওঠে।

এসব বজ্রকঠিন স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু কিছু চিরায়ত শক্তিশালী বাণী। কবিতার লাইন কিংবা গল্প, নাটক ও উপন্যাসের সংলাপ। মিছিলে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানারে মানুষ লিখে নিয়ে এসেছিল স্লোগান কিংবা কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেখানে ছিল জহির রায়হান থেকে শুরু করে হেলাল হাফিজের লেখা কবিতা। এসব স্লোগানের অন্যতম হলো– 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো'। এই স্লোগানটি জহির রায়হান রচিত। এটি কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে আরও শানিতরূপে। 'চেয়ে দেখ এই চোখের আগুন, এই ফাগুনেই হবো দ্বিগুণ'– স্লোগানটির ভিন্নরূপের অন্যতম উদাহরণ। যেভাবেই স্লোগানটি উচ্চারিত হয়েছে, তাতেই দারুণভাবে মূল সুরটি হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক। স্লোগানটির ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকগুলো ছিল আরও বেশি ব্যবহারোপযোগী ও কার্যকর। স্লোগানটির অন্তর্নিহিত শক্তি ফল্গুধারার ন্যায় বহমান। বহমান এর চিরন্তন প্রতিবাদী চেতনা। দিনে দিনে প্রতিবাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রতিবাদী চেতনার জয়গানই বিধৃত হয়েছে এই স্লোগানে।

ফাগুন এসেছে নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে। সাহিত্যের সকল শাখা ফাগুনের প্রভাবে হয়ে উঠেছে রঙিন। ফাগুন যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমান আর বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের মেলবন্ধ। ফাগুন নিয়ে আসে সজীবতা। নিয়ে আসে স্বপ্ন। ঋতুর রাজা বসন্ত আমাদের শিহরিত করে। বসন্ত বাতাসে আমরা ভেসে যাই। তৈরি হয় নতুন নতুন গল্প, নতুন নতুন ইতিহাস। এর যেন শেষ নেই। এ যেন চিরন্তন। মানব মনের খোড়াক জোগায় ফাগুন। ফাগুন হয়ে ওঠে স্বপ্নগল্পের নির্মাতা। তাই তো আমরা সমৃদ্ধ হই। আমরা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হই।

শীত শেষে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যেভাবে জেগে ওঠে, ঠিক সেভাবে রক্তস্নাত বিপ্লবের পর এবারের বসন্ত নতুন রূপে ধরা দিক জাতির কাছে। দেশ হয়ে উঠুক সাম্য ও ভালোবাসার, দায় ও দরদের। বসন্তের দোলা লাগুক সবার হৃদয়ে। ভালোবাসার ভ্রমর গান গেয়ে উঠুক প্রতিটি প্রাণে। জীবন উদ্ভাসিত হোক উচ্ছ্বাসে। কবিগুরুর কথায় আমরা গেয়ে উঠি, 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান/ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান/ আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ/ তোমার অশোকে কিংশুকে অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে'। 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো' স্লোগানের ন্যায় আমরাও প্রত্যাশী। ফাগুনের জয় হোক।

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ: সাংবাদিক, সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিট, একটি উদ্বোধনী খাম ও একটি সিলমোহর অবমুক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন তিনি।

এ সময় তথ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব ড. মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান এবং ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এস এম সাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া একই সময়ে সপ্তম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি স্মারক ডাকটিকিট, একটি উদ্বোধনী খাম ও একটি সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা। এ সময় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মুহাম্মদ এহছানুল হক, কমডেকা চিফ মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

রক্তে রাঙা একুশ

পঙ্কজ শীল

ফেব্রুয়ারির সকালে কুয়াশা এখনো জমে আছে চারপাশে। শহিদমিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আবিদ, হাতে লাল-সাদা ফুলের তোড়া। তার দাদু রফিক উদ্দিন চৌধুরী সবসময় এই দিনে শহিদমিনারে যেতেন, কিন্তু এবার পারেননি। বয়সের ভারে তিনি এখন শয্যাশায়ী।

আবিদের হৃদয় আজ অস্থির। ছোটোবেলা থেকে সে দাদুর কাছে ভাষা আন্দোলনের গল্প শুনে বড়ো হয়েছে। কিন্তু আজ, এত বছর পরেও, সে যেন পুরোপুরি বুঝতে পারে না– কী এমন ঘটেছিল যে মানুষ নিজের জীবন দিয়ে দিলো ভাষার জন্য?

ফুলগুলো শহিদমিনারের বেদিতে রেখে আবিদ ফিরে তাকায়। সেখানে অনেক মানুষ, অনেক ফুল, অনেক চোখের জল। হঠাৎ করেই তার মনে হলো, দাদুর পুরোনো ডায়েরিটা আবার একবার পড়া দরকার। হয়ত তাতেই সে পাবে সেই প্রশ্নের উত্তর, যা বছরের পর বছর তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে সে বের করল পুরানো একটা কাঠের বাক্স, যেখানে দাদুর ডায়েরিটা রাখা ছিল। ধুলো জমা কালো মলাটের বইটা খুলল–

তারপর পাতা উল্টাতেই অতীত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠতে লাগল...

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাস। ঢাকা উত্তাল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেছে। পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দিয়েছে, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, যারা সংখ্যায় বেশি, তাদের ভাষা বাংলা!

রফিক উদ্দিন চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার ছোটো ভাই আজাদ ছিল আগুনের মতো সাহসী, প্রতিবাদী। একদিন রাতে রফিক দেখল, আজাদ মোমের আলোয় কিছু লিখছে।

– কী লিখছিস?

– প্রতিরোধের শপথ, ভাই!

রফিক কাগজটা হাতে নিলো। তাতে লেখা–

'আমরা বাংলা ভাষার অধিকার চাই। যদি দিতে না চাও, তবে রক্ত দিয়ে আমরা পথ রাঙাবো।'

আজাদের চোখে একরকম দীপ্তি, যেন সে মৃত্যুকে ভয় পায় না।

– তুই তো খুব বেশি এগিয়ে যাচ্ছিস, আজাদ!
রফিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল।

– ভাই, ভয় পেলে হবে না। যদি আমরা ভয় পাই, তবে আমাদের ভাষা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।

রফিক চুপ করে থাকল। আজাদের সাহস তাকে হতবাক করত। ২১শে ফেব্রুয়ারি। সকাল থেকেই উত্তেজনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল বের করতে চেয়েছিল, কিন্তু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পাঁচজনের বেশি লোক একত্র হতে পারবে না। কিন্তু আন্দোলন থামানো যাবে না।

আতাউর, সালাম, বরকত, রফিক আর আজাদ মিলে দল তৈরি করল। সবাই মিলে এগিয়ে যেতে লাগল রাজপথের দিকে।

সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো–
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!'
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!'

শত শত কণ্ঠ মিশে গেল এক সাগর ঢেউয়ের মতো।

তারপর নিস্তব্ধতা। রাত গভীর হলে শহিদমিনারের সামনে অল্প কিছু মানুষ একত্র হলো। শহরে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে, পুলিশ পাহারা বসিয়েছে, যেন কেউ শহিদদের নামও উচ্চারণ করতে না পারে।

কিন্তু কিছু সাহসী ছাত্ররা চুপিচুপি শহিদমিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল। সেখানে রফিকও ছিল।

একটা পাথর টেনে এনে সেই কাঁচা বেদির উপর রেখে রফিক হাত দিয়ে লিখল–

'শহিদদের রক্ত বৃথা যাবে না। বাংলা জিতবেই'!

সে রাতে রফিক শপথ নিয়েছিল, আজাদের স্বপ্ন সত্যি করবেই।

আবিদ ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় এসে থেমে গেল। তার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে।

অবশেষে পুলিশ ব্যারিকেড দিলো। এক অফিসার মাইকে বলল, 'এগোলেই গুলি করা হবে!'

কিন্তু বাঙালিরা পিছিয়ে যাওয়ার জাতি নয়।

কেউ একজন চিৎকার করল– 'এগিয়ে চলো!'

মিছিল এগিয়ে গেল।

ঠিক তখনই প্রথম গুলির শব্দ!

রফিক দেখল, আতাউর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তার বুকের ওপর লাল রক্তের দাগ। মুহূর্তেই আরও কয়েকটি গুলির শব্দ হলো।

সে তাকিয়ে দেখল– আজাদও পড়ে গেছে!
রফিক ছুটে গেল তার কাছে, হাতে তুলে নিলো ভাইয়ের মাথা।

–আজাদ! চোখ খুল! তুই ঠিক আছিস, তাই না?
আজাদের ঠোঁট কাঁপল। এক হাতে রক্তাক্ত মাটি চেপে ধরে বলল, 'ভাই... বাংলা... জিতবেই...'

এত বছর পরেও, সেই রক্ত, সেই শপথ, সেই ত্যাগ– সবকিছু যেন এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে।

তার মনে হলো, দাদুর সেই কথা সত্যি হয়েছে।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি কেবল বাংলাদেশের নয়, সারাবিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

কিন্তু তারপরও, প্রশ্ন থেকে যায়–

আমরা কি সত্যি ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি?

আবিদ জানে, উত্তর খুঁজতে হলে তাকে শহিদমিনারের পথ ধরতে হবে, বুকে ধারণ করতে হবে রক্তে লেখা বর্ণমালা।

সে আবার বেরিয়ে পড়ে, হাতে নতুন একগুচ্ছ ফুল নিয়ে, শহিদমিনারের পথে।

বই, গ্রন্থাগার ও বইমেলা

স্বপন বিশ্বাস

আদিকাল থেকেই বই শিক্ষিত সমাজে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বই হলো গর্জনহীন হাতিয়ার, যার কথা আছে কিন্তু কণ্ঠ নেই। মহাপুরুষদের ভাষায়– 'যে জাতি যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি তত বেশি উন্নত এবং তত বেশি সভ্যতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে'। এছাড়া বলা হয়ে থাকে– 'একটি বই ১০০টি বন্ধুর সমান'। আবার সূর্যহীন পৃথিবী যেমন অন্ধকার, তেমনি বই ছাড়া জাতির জীবনও অন্ধকার। মানুষ যাতে দেশ ও জাতি গঠনে সহজ ও সঠিক দিক নির্দেশনা পায়, সেজন্য প্রচুর বই পড়া প্রয়োজন। জ্ঞানের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ এবং অজানাকে জানার যে সাধ, তা মেটানোর জন্য চাই বই। যখন সাধারণ মানুষের পক্ষে জ্ঞানচর্চা সহজ ছিল না, তখনো রাজা কিংবা কোনো ধনী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বই রচনা হতো এবং বই পড়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা হতো।

বই সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রায় সব দেশেই ছোটো-বড়ো গ্রন্থাগার রয়েছে। জ্ঞান সৃষ্টিতে বইয়ের ভূমিকা যেমন অপরিসীম, তেমনি জ্ঞান বিতরণের মাধ্যম হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকাও অনেক। যে জাতি তার বইয়ের সমাহার বৃদ্ধি করতে পেরেছে, সে জাতি ততই উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই পরিবারে ছেলেমেয়েদের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করার জন্য একটি পারিবারিক মিনি লাইব্রেরি থাকা আবশ্যক। এই সব লাইব্রেরিতে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, আত্মজীবনীমূলক বই, প্রবন্ধ, নাটক ও নৈতিক শিক্ষামূলক বই রাখা যেতে পারে। ছেলেমেয়েরা যাতে এই সব বই পড়ে তার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। প্রয়োজনে ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবা-মাকেও সময় দিতে হবে। অভিভাবকরা একটু মনোযোগী এবং সচেতন হলেই ছেলেমেয়েদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লাইব্রেরির যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষকে শুধু জ্ঞানের রাজ্যের পথ দেখাতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা নিজেকেই করতে হয়। বই আমাদের সহজেই সেই জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে। বই মানুষের অজ্ঞতা দূর করার জন্য কত উপযোগী, তা বলে শেষ করা যাবে না। তাই হাতে সময় যত স্বল্পই হোক, প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়ার অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে চালিত করার মুখ্য মাধ্যম হলো বই। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রেও আমরা সহজেই বইকে বেছে নিতে পারি, তা সে যে বয়সেরই হোক না কেন। প্রতিটি প্রজন্মের জন্য বই হোক নিত্যসঙ্গী এবং উৎকৃষ্ট হাতিয়ার।

আমাদের দেশের বইমেলা বললেই কোনো দোহাই ছাড়াই মনোভুবনে হাজির হয় অমর একুশে বইমেলার ক্যানভাস। ভাষার মাস মানেই ফেব্রুয়ারি মাস; কেন্দ্রবিন্দু বাংলা একাডেমি। ২০১৪ সালে প্রকাশকদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বইমেলাটি বাংলা একাডেমির পাশাপাশি নিকটবর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও সম্প্রসারিত করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই বই পড়া এবং

বইমেলার বিষয়টি চলে আসে। দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষায় থাকে পাঠক-প্রকাশক। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সমাবেশ ঘটে লেখক ও পাঠকের। বইমেলাকে ঘিরে নবীন ও তরুণ লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যকদের। বইমেলাকে ঘিরে লেখক ও পাঠকদের প্রত্যাশাও থাকে অনেক। 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছে।

বইমেলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বই পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছুতে বইমেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পছন্দের বইটি সহজে হাতের কাছে পাওয়ার একটি মোক্ষম উপায় এই মেলা। বইমেলা যে শুধু ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, তা নয়। বর্তমান বইমেলা সারা বাংলাদেশেই জেলা শহর ও উপজেলা পর্যায়েও অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলায় বই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যারা লেখালেখি করেন, তারা অপেক্ষায় থাকে বইমেলায় বই প্রকাশ করার। প্রতি বছর একুশে বইমেলায় নতুন লেখকের নতুন নতুন বই আসে। বই লেখা এবং বই প্রকাশ করা লেখকের মনে এক ধরনের উচ্ছ্বাস কাজ করে। বইমেলার মাধ্যমে অনেক লেখকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। লেখক তার প্রকাশিত পুস্তক স্টলে বসে পাঠকের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং পাঠকও লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। অনেকে প্রিয় লেখকদের অটোগ্রাফ সংগ্রহে রাখেন, ছবিও তোলেন। বইমেলার মাধ্যমে নতুন নতুন পাঠকও তৈরি হয়। বইমেলার মাধ্যমে ভালো বই এবং গুরুত্বপূর্ণ বই খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

প্রতি বছর একুশে বইমেলা মিলন মেলায় পরিণত হয়। বইমেলায় শিশু-কিশোর কর্নার থাকে। যেখানে বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়। কোমলমতি শিশুদের মনে বইমেলায় আগমনের মধ্য দিয়ে বইয়ের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয় এবং এর প্রভাব সারা জীবন থেকে যায়। ২০২৪-এর জুলাইয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে এ বছর বইমেলায় 'জুলাই চত্বর' করা হয়েছে। যেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন চিত্রমালা, গ্রাফিতিসমূহ। এছাড়া রয়েছে 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' স্টল। অমর একুশে বইমেলায় যেহেতু লাখো মানুষের সমাগম হয় তাই 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' প্রচার এবং স্টলে ফাউন্ডেশনের তথ্য কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করছে। এ স্টলে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রামাণ্য চিত্র পরিদর্শনের এর জন্য রয়েছে এলইডি স্ক্রিন এবং আহত যোদ্ধাদের ফরম জমা নেওয়ার জন্য রয়েছে বিশেষ বুথ।

বই হোক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। আর বছর ঘুরে ফিরে আসা বইমেলা অনেকটাই যেন প্রাণের মেলা। বই মনকে পবিত্র করে এবং চারদিকের বিরূপ পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখে। বই শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, জাতি গঠনের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। বই মনের মধ্যে আপন ভুবন সৃষ্টি করে এবং নিঃসঙ্গতা দূর করে। ইউনেস্কোর ভাষায়– 'বই মানুষকে সর্বাধিক আলোকিত করতে পারে'। তাই পরিবারকে নিয়ে বইমেলায় আসুন-ঘুরুন-পড়ুন এবং উপভোগ করুন বইমেলার হৃদয়ছোঁয়া আমেজ। প্রিয়জনকে বই উপহার দিন। নির্ভেজাল এবং সঠিক সঙ্গী হিসেবে বইকে প্রাধান্য দিন। আপনার জ্ঞান অর্জনের জন্য পছন্দের বইটি বেছে নিন। বইকে ভালোবাসুন।

স্বপন বিশ্বাস: প্রাবন্ধিক

সরকার ৫০ ঊর্ধ্ব বছরের বৃক্ষের তালিকা করবে

সরকার ৫০ বছর বা তার বেশি বয়সের বৃক্ষের তালিকা তৈরি করবে। এলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিশেষ ধরনের গাছ ও বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, স্মারকবৃক্ষ, পবিত্রবৃক্ষ, প্রাচীনবৃক্ষ ও কুঞ্জবন ঘোষণার আবেদন চেয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর ধারা ২৩ (১) অনুযায়ী এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী পুরাতন বয়স্ক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত মূল্য সমৃদ্ধ দেশীয় উদ্ভিদ বা শতবর্ষী বৃক্ষকে 'স্মারকবৃক্ষ'; এবং ধর্ম ও গোত্রের জনগোষ্ঠীর নিকট স্বীকৃত পবিত্র উদ্ভিদকে 'পবিত্রবৃক্ষ' বলে বন অধিদপ্তর জানায়। এ অধিদপ্তর আরো জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মের সমাহার হলো 'কুঞ্জবন'- যা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকট সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রথাগতভাবে মূল্যবান।

স্মারকবৃক্ষ, পবিত্রবৃক্ষ, প্রাচীনবৃক্ষ বা কুঞ্জবন চিহ্নিত করতে চাইলে বৃক্ষের বা কুঞ্জবনের নাম (স্থানীয় নামসহ যদি সাধারণ নাম থাকে), এলাকার নাম, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ যে সকল হাওর-জলাভূমি, বনভূমি, পাহাড়ে অবস্থিত তার নাম, ক্যাটাগরি, আনুমানিক বয়স, সংরক্ষণকারীর নামসহ এসব বৃক্ষের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য, সংরক্ষণ বা টিকে থাকা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ বা সমস্যাসহ প্রস্তাবকারীর নাম, যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ আবেদন পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষকের টেলিফোন নম্বরে (৫৫০০৭১১১) যোগাযোগ করা যাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য ও বৃক্ষ বা কুঞ্জবনের স্পষ্ট ছবিসহ ৩০শে মার্চের মধ্যে ডাকযোগে ও cf-wildlife@bforest.gov.bd ইমেইলে এ অধিদপ্তরে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। ডাকযোগে আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রতিবেদন: সৌভিক মোদক

ভাষা সংসার

ইমরুল কায়েস

শরাফত করিম 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পরিভাষা' রচনার নেশায় কবর দিয়েছে পাক্কা একুশটি বসন্ত! স্নেহার পিএইচডির খতিয়ান খতম হলেই হবে চার হাতে দুই হাতের এমওইউ– বিয়ে। শরাফত করিমের জীবন কিন্তুময়! তাই বিয়ে নিয়ে খুব একটা পরিমরি ভাবাবেশ উদয় হয় না। বিষয়টা সময়ই সমাধান করবে।

নিজ বর্ণমালায় মোবাইলে সম্বোধন করা যায় এমন একটি শব্দ গবেষণা করে বের করতে হবে! আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। একটু আগে যা ঘটল শরাফতের জীবনে তা পৃথিবীর কোনো ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। হায় সময়!

সাঁইত্রিশ বছর প্রাণবায়ুর চেম্বার এই শরীরে যৌবনের উজানে নাও কী পাল তুলবে? 'নদী আর নারী গতিতে চলে। স্থিরতায় মরে যায়!'– দুটি সম্পর্কের সমাপনী এসএমএস কাম খুদে বার্তা দিয়ে ইতি টানলেন। শরাফতের স্নেহা উপাখ্যান।

জীবন সিদ্ধ জ্যামিতি। আরও বোঝা যায়, বেকার জীবনে কোনো বিত্তশালী পিতার দুলালির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালে। ওই যে শরাফতের জীবনে 'কিন্তু'! যে নারী তার পছন্দের পুরুষকে সব দিতে ভেতর-বাহির একাকার করে, সেই নারীর প্রেমে পুরুষ কমই পড়ে। পুরুষ জয় করতে পছন্দ করে। শরাফত তো আরও সাত সিঁড়ি উপরে উঠা পুরুষ। তার মন নামক কেন্দ্রটি স্নেহা বৃত্তের পরিধি ছুটে বাইরে যেতে চায় না।

স্নেহার রূপের চেয়ে গুণই করিমের কিন্তুর মূল কারণ। এই মেয়েটি কী পারে না? আবৃত্তি, অভিনয়, শাস্ত্রীয় নৃত্যের রুনুঝুনু ধিনতানা ধিন– সব ললিত চর্চায় নিমগ্ন স্নেহা। শরাফতের স্নেহা বৃত্তের কেন্দ্রে পাক খাওয়ার এটিও কারণ। শরাফতের মন তবলায় বোল তুলেছে স্নেহা– যেদিন ওদের বিভাগের স্নাতকের বড়ো ভাইদের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করল সেদিনই সাংঘাতিক স্নেহা নামক 'কিন্তু' ভর করে শরাফতের মনে।

শরাফত তখন চতুর্থ বর্ষের স্নেহাদের সিংহসম বড়ো ভাই। সে নিজেও যেমন আদর্শ শারীরিক উচ্চতার ছেলে, তেমনি আবার তার গবেষণা ও পড়াশোনার ক্যারিশমা প্রশংসার। শরাফতের নোট তবারকের কারণে তার ব্যাচমেটরা পরীক্ষা নামক পুলসিরাত অনায়াসে পার হতো। অবশ্য নোট বাণিজ্য শরাফতের রুটিরুজিরও ফয়সালা করে দিত। বিত্তবৈভবে গা ভাসানো বন্ধুরা শরাফতের মেস খরচ ও মাসিক হাতখরচা চালিয়ে নিত। এই নিয়ে শরাফতের মনে কিন্তু আসে নাই বিষয়টা একেবারে তেমন না। করিম বহুবার সময় নষ্ট করে টিউশনিতে নাম লিখিয়েছিল। কোনোভাবে পরাধীন পেশা– ছাত্রছাত্রী পড়ানো তাকে আটকাতে পারেনি। তার কাছে এ পেশাকে বাধ্যানুগত টেপরেকর্ডারতুল্য মনে হতো। সাথে আরও বড়ো ঘটনা– টিউশনিতে ছাত্রছাত্রীর চেয়ে মা ও বাবার অতীব ইংরেজি প্রীতি আরও বেশি করে পীড়া দিত। ফলে, জীবনে শেষবারের মতো টিউশনিকে ফুলস্টপ দিয়েছিল।

চিন্তার মুক্তি বাঙালিদের আজও ঘটেনি; কারণ বাংলা ভাষার কার্যকর ব্যবহার বাড়েনি। ইংরেজি ভাষার যথেচ্ছা ব্যবহার কি মাতৃভাষা বাংলাকে ছোটো করছে না? পথ-ফুটপাতের নিকারি দোকান থেকে পাদুকালয়ের নামফলক সব ইংরেজিতে। অন্তত দোকান-প্রতিষ্ঠানের নামফলকগুলো বাংলায় করা জরুরি। শরাফতের মেজাজ সহজে ভাসে না। তবে বাংলা ভাষার ভুল ব্যবহার ও পরভাষা আশ্রিত কাণ্ডকারখানা দেখে ঠিক থাকতে পারে না। এটি কি কেউই ভাবে না– ভাষা শুধুই ভাষা নয়। এটি জাতীয় পরিচয় ও সার্বভৌম শক্তি প্রচারের মাধ্যম। বাংলা ভাষাকে বাইপাস করার অপচেষ্টা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর।

পকেট ও বিত্তভাবনা নিয়ে শরাফত জীবনের কোনো ক্ষুদ্র সময়ও নষ্ট করতে চায়নি কখনো। তাঁর নোট রচনার দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নাম এনে দিয়েছে– নোটডিলার! শুরু থেকে এই অভিধা শুনতে বিরক্ত হয়নি শরাফত। কোনো কিছুতে বিরক্ত ও আসক্ত হওয়াই অসুখ বাধানোর মূল কারণ। মেজাজকে উঠকো ভাবনায় রাগিয়ে তোলার কোনো মানেই দেখেনি জীবনে। বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেদিন– বন্ধু শিমুল যেদিন জুনিয়র স্নেহার সামনে বলেছিল, কী রে নোট ডিলার? নোট দিয়ে লেডি কিলার হয়ে গেলি! অন্তর রাগে বিস্ফোরিত হচ্ছিল। সামলে নিল কষ্ট করে।

'লেডি কিলার' কীরকম বিশ্রী কথা! মরমে লাগে এসব বিদেশি শব্দের এমন বাংলিশ ব্যবহারে। বাংলাদেশের ভাষাটির কি কোনো রাজনৈতিক উন্নতি হবে না। পাশেই স্নেহা বসে। কী ভাবল এই জুনিয়র মেয়েটা। অভিব্যক্তিতে যা বোঝা গেল– স্নেহার কান এমন সুরসুরি দেওয়া সফিসটিক্যাটেড কথা শুনতে প্রস্তুতই ছিল না। জরুরি ডিবেট ক্লাবের মিটিং আছে বলে সরে পড়েছিল শরাফত। সেদিনকার মতো পালিয়ে রক্ষা। নইলে শিমুলের সঙ্গে খামোখা বাদানুবাদ হতো। করিম অনেক সময় প্রস্থান করে প্রতিবাদ জানায় মুখে কিছু না বলে।

আড্ডায় জুনিয়র সিনিয়র অনেকেই বসে ছিল। মধ্যমণি যে শরাফত ছিল এটা স্নেহা বুঝে ফেলল। এটাই বুঝল যে, বেচারা তার সামনে বিব্রত। পালিয়ে বাঁচার বুদ্ধিদীপ্ত বিষয়টি হঠাৎ মৃদু দখিনা হাওয়ার মতো রেশমি খোলা চুলে দোলা দিয়েছিল। স্নেহা যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেট সংঘের নব্য সদস্য হয়ত শরাফত করিম এটা জানে না।

স্নেহার ভাষা অধ্যয়ন বিভাগে ভর্তির অন্যতম কারণ ছিল বাংলা ভাষার কুলজি জানা। স্নেহার ছোটোবেলা থেকে ভাষার বর্ণ ও শব্দ এমনকি বাক্য নিয়ে দারুণ কৌতূহল– কী সুন্দর করে বিশেষ্য পদ সর্বনাম ও ক্রিয়া পদকে সঙ্গে নিয়ে চলে। ভাষার সঠিক ব্যবহারটি এর উচ্চারণে। বর্ণদের উচ্চারণ স্থানের সঙ্গে মানুষের শরীরবৃত্তিয় বিবর্তন আছে। ভাষা শুধু বলার বাহন নয়। ভাষা সংকেত চিহ্ন ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে চলে। ভাষা আবার চমৎকারভাবে নদীর মতো প্রবহমান। ভাষার ভাবনা নিয়ে শরাফত করিমের সঙ্গে স্নেহার সংযোগ ঘটেই আছে। হুট করে স্নেহার এই ভাবনা উদয় হতে কেমন জানি একটা শিহরণ বোধ হয়েছিল! তাহলে কী শরাফত করিমের নীরব পাশ কাটিয়ে চলা স্নেহাকে নতুন আবেশ দিচ্ছে। আবেশ এটাই নতুন তা তো না। পুরানো পরিণয় স্মৃতিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল শরাফতকে।

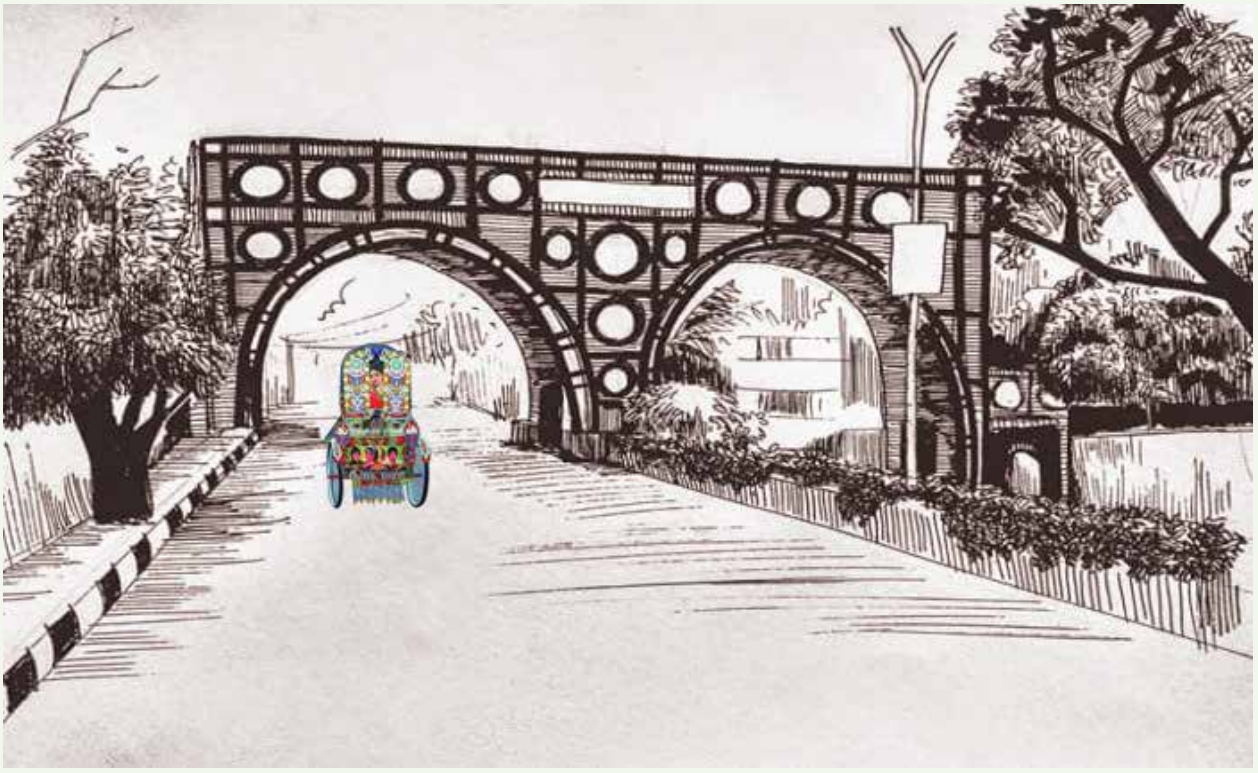

শরাফত করিম তার এমএ পরীক্ষার জন্য থিসিস নিয়েছে। থিসিসে বিজ্ঞান চর্চায় বাংলা ভাষার পরিভাষা নিয়ে কাজ করছে। ভাষা বিভাগে ভর্তির পর থেকেই এই ইচ্ছে যে, 'বাংলাদেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই'– এই বিষয়ের সমস্যাটি খুঁজে বের করা। একটি বই লেখাকে ব্রত ধরে এগিয়েছে শরাফত। গতানুগতিক সরকারি ছা-পোষা চাকরির আশা করেনি শরাফত করিম। ভাষা নিয়ে লেখাপড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে পরে থাকা তার নিত্যদিনের চা পানের মতো।

সেদিনের আড্ডার ঘটনার পরে শরাফত করিম খুব সতর্ক হয়েছিল। সে বিভাগের সেমিনার পাঠাগার এড়িয়ে চলে। কোথাও বসে থাকলে একাই থাকে। একটা নীরবতা শরাফতকে আষ্টে ধরেছে। কিন্তু কেন? এই জড়তা কে দিলো? আর কী ভাবে তার মন।

এদিকে স্নেহা বির্তক সংঘের নতুন সদস্য হিসেবে পরপর দুটি বির্তকে সেরা বক্তা নির্বাচিত হয়েছে। বির্তক সংঘ আয়োজন করে স্নেহাকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা জানাতে চায়। অনুষ্ঠানের দিন স্নেহা মন স্থির করেছে তার মায়ের বিয়ের শাড়িটি পরবে।

সংঘ থকে জানানো হলো পুরস্কার ও সম্মাননা অনুষ্ঠান আসছে ২১শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। দাওয়াত পত্রে স্বাক্ষর দেখে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল স্নেহা। চিকন হাসি ঠোঁটে ঝিলিক দিলো। আবারও কেন এই হাসি। চিঠির স্বাক্ষরের নীচে লেখা সাধারণ সম্পাদক– শরাফত করিম। বির্তক সংঘের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাওয়াত নিব না। মনে মনে মিষ্টি অভিমান স্নেহার। সাহেব আসছে এতদিন পরে আস্তানা থেকে। আচ্ছা তার জন্যে কেন এই অভিমান। তার সাথে তো স্নেহার মিনিট পাঁচেকরই কথা হয়নি। তবুও কেন তিনিই মাথায় ঘুরছে। স্নেহা গত দুসপ্তাহ ধরে তো গরু খোঁজা খুঁজেছিল শরাফত করিমকে! তখন এই সাধারণ সম্পাদক মশাই কোথায় ছিল?

গাঢ় অদেখা অভিমান মনে ও পেটে ডুবিয়ে রেখে অনুষ্ঠানে এসেছিল স্নেহা। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটা শুরু হলো শরাফত করিমের সাথে কথা দিয়েই। শরাফত তাকে স্বাগত জানিয়ে বসার আসনে নিয়ে গিয়েছিল। চমৎকার সম্ভাষণ– শুভেচ্ছা জানবেন, স্নেহা শারমিন আসুন আপনার আসন দেখিয়ে দিই। প্রতিটি শব্দ ও উচ্চারণ একদম সৈয়দ শামসুল হকের মতো করেই বলল। উত্তরে স্নেহা মুখে কথাই বলেনি। একান্ত অনুগত শিষ্যের মতো শরাফতের পিছু পিছু গিয়ে বসেছে। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন যে যার দিকে যাচ্ছে শরাফত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। অবশ্য অতি সন্তর্পণে চোরাচোখে খুঁজছে কাউকে। আবার ভাবে– না না, বিত্তশালী পরিবারের কন্যা। তার কেশচর্চার বাঁধুনি দেওয়ার সামর্থ্য শরাফতের নেই। তবুও মন ধায়– আইন যার কাছে হোঁচট খায় সে একমাত্র মন। মনের কথা না শুনছে বলে গত ৩ মাস ধরে নীরব ও নিথর হচ্ছে। শক্তমনের চাঙাভাবটা কমে যাচ্ছে কেন?

মিলনায়তনের সদর দরজা দিয়ে সব কিছু বুঝে নিয়ে বের হতে যাচ্ছে শরাফত। বাঁয়ে একটু কোণে তাকিয়ে দেখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে একবারই কী যেন বলল, শরাফত করিম বুঝে কিছুক্ষণ মৌন অভিমানে চুপ থাকল। তবে খুশি হয়েছে সে। স্নেহার দিকে এগিয়ে গেলে সে মৃদু সম্ভাষণ হাসি দিয়ে বলল, একটা রিকশা ডেকে দিতে পারবেন, যদি আপনার কষ্ট না হয়। আচ্ছা বলে শরাফত করিম রিকশা নিয়ে মিনিট পাঁচেক পরেই হাজির।

রিকশা দাঁড়িয়ে আছে; কেউই উঠছে না দেখে রিকশাওয়ালা মামা বলল, মামা যাবেন না? দুজনে একসাথে মুচকি হেসে দিলো। জি বলে স্নেহা উঠে পড়ল রিকশায়। উঠে, শরাফতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কোনো অসুবিধা না থাকলে আসুন, আসুন। শরাফত করিম বলল, আমি কি পেছনে আর একটা রিকশা ডাকব? উত্তরে স্নেহা বলল, আমি কি এই রিকশাকে ভাড়া চুকিয়ে দিব?

রিকশা চলছে...। গল্প চলছে মৃদু ছন্দে।

ঘণ্টাখানেক রিকশায় ঘুরছে। কেউই গন্তব্য বলে নাই। সচেতন বা অসচেতনভাবেই হোক দুজনেই রিকশাওয়ালাকে বলেনি। রিকশা চলছেই...।

শরাফত করিম পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি স্বপুষ্ট তাজা লাল গোলাপ বের করল। গোলাপটি দেখুনতো বলে স্নেহার হাতে দিলো। গোলাপও হাসছে, স্নেহাও তার মনের সুবাস যেন চুলের সাথে বের হচ্ছে। আপনার গোলাপটি তো পুরানো হয়ে গেল। এই নিন, বলে স্নেহা শরাফতের দিকে এগিয়ে দিলো। তাই তো দেখছি, আপনিও তো গোলাপটি পুরানো হতে দিলেন। সজীব করুন গোলাপকে। আপনার চুলের খোঁপায় অনেক পুষ্টি আছে। ওখানে তুলে নিন। আমি কী করে নিব? আপনার গোলাপ আপনি দেখুন। শরাফত করিম সাবধানে গোলাপটি স্নেহার খোঁপায় গুজে দিলো।

গোলাপে-আলাপে এভাবে দুজনের ২টি ফেব্রুয়ারি চলে গেছে। ভাষা নিয়ে তাদের কত যৌথ প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ফুল-বাতাস-বৃক্ষ-পুকুর-গাছের সমস্ত শুকনো পাতা শরাফত ও শারমিনের ভাষা সংসার কাহিনি জানে।

অথচ আজও ২১শে ফেব্রুয়ারি এই শহিদমিনারে এসে শরাফতকে মোবাইলের খুদে বার্তায় জানাতে হলো– স্নেহা যেন তাঁর বাবার পছন্দের বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক ও অধ্যাপক ড. জাহেদকেই তাঁর জীবনের জমানো সব গোলাপের সুবাস দেয়। স্কলারশিপসহ কত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিদেশে আবাস করা স্বামীর সাথেই বেশ মানায় স্নেহাকে! গবেষক শরাফত তো সামান্য গবেষক।

বছর তিনেক পরে সরকার শরাফত করিমকে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পরিভাষা' বিষয়ক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্যে একুশে পদক প্রদান করে। একই ঘটনা বছর তিনেক আগে ঘটলে তার জীবন অন্যরকম হতো! জীবন মধুময় হতো! ভাষাময় সংসার হতো!

বিস্ময় বাংলার মুখ

লুৎফর রহমান সাজু

তোমার উপরে উঠানো দুহাত
বুলেটে পাতানো বুক
আমি অপলক চেয়ে থাকি বন্ধু
তুমি বিস্ময় বাংলার মুখ।

আমি কৃষ্ণচূড়া দেখিনি আজ
তোমার রক্ত এত লাল।
রক্তজবা খুঁজিনি আমি
হয়ে গেছি বেসামাল।
সারাবিশ্ব জেগেছে আজ
মুছে গেছে সব দুখ।
আমি অপলক চেয়ে থাকি বন্ধু
তুমি বিস্ময় বাংলার মুখ।

কোন নরপিশাচের বেয়নেটে
তোমার কেড়ে নিলো তাজা প্রাণ
নাকি, অধিকারহারা মানুষের জন্য
স্বেচ্ছায় জীবন করেছ দান।
জীবন দিয়ে তুমি করে গেলে ঋণী
ভরে গেছে এই বুক।
আমি অপলক চেয়ে থাকি বন্ধু
তুমি বিস্ময় বাংলার মুখ।

ভাষার মাসে

শামসুল আরেফীন

বাংলা আমার মাতৃভূমি
লাখ শহিদের দান,
হাজার বছর থাকুক বেঁচে
এই বাংলার সম্মান।

রক্ত দিয়ে ঋণী করে
গেছেন যেসব ভাই,
তাদের মূল্য ক্যামনে দিবো
আমার জানা নাই।

ভালো থাকুন রফিক-জব্বার
ক্ষমা করেন রব,
ভাষার মাসে মনে পড়ে
যাঁরা ছিল সব।

রক্তে রাঙানো একুশ

শফিকুল মুহাম্মদ ইসলাম

বুকের পরে করে গুলি
নিতে চাইলো বাংলা বুলি
আমার বাংলাদেশে,
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
মায়ের ভাষার শক্তি নিয়ে
আনলো কিনে শেষে।

ফের যদি কেউ এমন করে
পিষ্ট করবো বাংলার পরে
মানবো না আর বাধা,
আমার ভাইয়ের রক্তের সৌরভ
বাংলা ভাষার চির গৌরব
থাকবে নাকো ধাঁধা।

বছর ঘুরে এলে ফাগুন
মনের ভেতর জ্বলে আগুন
ভাসে ভাইয়ের স্মৃতি,
বাংলা ভাষার জন্য তারা
ছিল কত পাগলপারা
নিয়ে হাজার প্রীতি।

রফিক-শফিক-সালাম-বরকত
ইতিহাসে রইল মহৎ
তাঁদের আত্মদানে,
ফেব্রুয়ারির একুশ পেলে
শহিদ স্মৃতির পাতা মেলে
ব্যথা বাজে প্রাণে।

বাংলা আমার

জিহাদুল আলম

বাংলা আমার মায়ের মুখে
প্রথম শেখা ভাষা
এই ভাষাতে কথা বলে
জুড়ায় মনের আশা।

বাংলা আমার বাহান্নতে
অ আ ক খ বুলি
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
কেমন করে ভুলি!

বাংলা আমার ফেব্রুয়ারির
প্রভাতফেরির ফুল
বাংলা আমার মধুর ভাষা
মিষ্টি ও তুলতুল।

মধুর ভাষা বাংলা

কাজল নিশি

একুশ মানে ভাই হারানো
বোনের চোখে জল
বাংলা মা তোর মধুর ভাষা
বিশ্বে সমুজ্জ্বল।

একুশ মানে বাংলা ভাষায়
কথা বলি হেসে
বাঁচতেও চাই ধরার বুকে
বাংলা ভালোবেসে।

একুশ মানে ভাষা দিবস
হৃদয়জুড়ে থাকা
খোকাখুকুর ড্রয়িং খাতায়
শহিদমিনার আঁকা।

শহিদমিনার

সুশান্ত কুমার দে

সবুজ ডাঙায় রক্ত রাঙায়
আঁকছে খোকা কী?
ফুলের বিথার শহিদমিনার
খোকার ভাবনা টি!

শহিদ বেদিতে ফুলদিতে
আঁকছে তারই ছবি?
সারি সারি মুখটা ভারি
শোকের প্রতিচ্ছবি!

হঠাৎ নিথর মনের ভিতর
খোঁচা মারল কে?
ঐ যে আঁকা রক্তে মাখা
ঐ ছবিটাই যে!

জীবনটাকে গড়ি

ফরিদ সাইদ

আমরা যারা ছোট্ট শিশু
পড়ালেখা করি
জেনে-বুঝে জ্ঞানের শাখায়
জীবনটাকে গড়ি।

বলেন যেমন পিতামাতা
তাদের মতো চলি
চলার পথে সকল কাজে
সত্য কথা বলি।

ভুলে থাকি মান-অভিমান
আছি মিলেমিশে
গড়বো নতুন সুখের সমাজ
ভাবনা আবার কিসে!

দুহাত বাড়াই দেশের জন্য
দেখবো সবার হাসি
জন্মভূমি সোনার স্বদেশ
অনেক ভালোবাসি।

ছেলেবেলার গান

রফিকুল নাজিম

কোথায় গেল ছেলেবেলা পাই না খুঁজে আর
পাই না খুঁজে পাখির বাসা– ছোট্ট ছানা তার।
কোথায় গেল বালিহাঁস আর পানকৌড়ির দল
নদীর জলে সাঁতার কাটার– দুপুরটা কই বল।

কোথায় গেল হাওয়াই মিঠাই– ফেরিওয়ালা লোকটা
আলতা চুড়ি লেইস ফিতা– দস্যিছেলের বুকটা,
কোথায় গেল শেখের বাগে আম চুরির সেই ধুম
লাল পরিটা, নীল পরিটা– ভূত দেখা সেই ঘুম।

কোথায় গেল বাউরি বাতাস গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ি
কোথায় গেল নাড়ু দেয়া– সেই যে কুঁজো বুড়ি,
উড়াল হাওয়ায় যাচ্ছে সময়– মনে কত স্মৃতি
বুকের ভেতর ছেলেবেলা গাইছে বিষাদগীতি।

বিস্ময়ে ভরা সুন্দরবন

শহিদুল ইসলাম

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ লুকিয়ে আছে। এই সম্পদ একদিকে যেমন বৈচিত্র্যময় অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিশ্বের বুকে যে কয়টি বিষয় বাংলাদেশকে এক ও অদ্বিতীয় করেছে তার মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম। সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর-চব্বিশপরগনা ও দক্ষিণ-চব্বিশপরগনাজুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি।

১০,০০০ বর্গকিলোমিটারজুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ রয়েছে ভারতের মধ্যে। অপার বিস্ময়ে ভরা সুন্দরবন। এ বন ২৪ ঘণ্টায় রূপ বদলায় ছয় বার। সুন্দরবন খুব ভোরে এক রূপ। দুপুরে অন্য রূপ। পড়ন্ত বিকেলে আরেক রূপ। সন্ধ্যায় সাজে ভিন্ন রূপে। মধ্য ও গভীর রাতে সৌন্দর্য আরেক রকম। চাঁদনি রাতে এই বনের মোহনীয় রূপ পর্যটকদের মোহিত করে। কচিখালী সমুদ্রসৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার রয়েছে সুযোগ। এ বনে রয়েছে প্রায় ৪৫০টি নদনদী ও খাল। সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, গরান, গোলপাতাসহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছপালা, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল ও ১৩ প্রজাতির অর্কিট রয়েছে। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল-মায়া হরিণ, লোনা পানির কুমির, অজগর, কচ্ছপ, বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ইরাবতী ডলফিনসহ ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ৩২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ সরীসৃপ, ৮ উভচর ও ৩০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, খাল, শত শাখানদী, কাদাচর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। মোট বনভূমির প্রায় ৩১.১ শতাংশ অর্থাৎ ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটারজুড়ে রয়েছে নদীনালা, খালবিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ অঞ্চল। সুন্দরবনের প্রতি পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানান সৌন্দর্য, যার প্রতিটি অঞ্চল এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যরূপে পর্যটকদের কাছে ধরা দেয়। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সাথে এই বনের জীববৈচিত্র্য এটিকে পৃথিবীর অন্য যে-কেনো পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্ররূপে উপস্থাপন করেছে।

সুন্দরবনের নামের সাথে যেই বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত তাহলো বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ২০১৫ সালের বন বিভাগের জরিপ মোতাবেক বনে ১০৪টি বাঘ থাকার কথা জানা যায়। তবে ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১২১টি। যদিও এই সংখ্যা খুবই উদ্বেগজনক। কারণ ২০০৪ সালের বন বিভাগের জরিপে বলা হয়েছিল সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৪৪০টি। সুতরাং বর্তমান পরিসংখ্যান আমাদের দেশের পর্যটনের জন্য তথা সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য মোটেই শুভকর নয়। অপরদিকে সুন্দরবন এলাকায় বর্তমানে প্রায় ১০০০০০ থেকে ১৫০০০০ চিত্রাহরিণ রয়েছে বলে জানা যায়, যা এর সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। পর্যটকরা বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চিত্রাহরিণের ছুটাছুটি দারুণ উপভোগ করে থাকে।

সুন্দরবনের মধুর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। প্রতিবছর এ বন থেকে ১৫ থেকে ২০ হাজার মণ মধু আহরিত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের মধুর ওপর নির্ভর করে প্রায় ১০ হাজার মানুষ তাদের জীবিকানির্বাহ করে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের গোলপাতা শুকিয়ে ঘরের চাল ও বেড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবছর হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি দর্শনার্থী, পর্যটক, পর্যবেক্ষক, জাহাজ, বণিক আসছে সুন্দরবনের এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। আর এভাবেই সুন্দরবন দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার হিসেবে স্বীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করছে। সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য এক বিরাট আয়ের উৎস। এই বনের আশপাশ ঘিরে থাকা নদী ও খাল জালের মতো বিস্তৃত রয়েছে। এসব নদী ও খাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, সাদা মাছ, কাঁকড়া আহরণ করে তা স্থানীয় বাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে হাজার হাজার জেলে পরিবার তাদের জীবিকানির্বাহ করে থাকে। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ঘিরে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এই বনের সৌন্দর্য দেখতে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন ভ্রমণপিপাসুরা। তবে বন ঘিরে মানুষের যত আগ্রহ, কিছু অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সেটা মেটাতে পারছেন না পর্যটকরা। এগুলোর বিষয়ে উদ্যোগ নিলে পর্যটকদের কাছে সুন্দরবন ভ্রমণ আরও আনন্দের হবে। এখানে পর্যটনশিল্পের বিকাশ হলে বদলে যাবে দেশের অর্থনীতি ও এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা। পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতি বছর লাখো পর্যটক বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন দেখতে আসেন। বিশেষ করে শীত মৌসুমে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

সুন্দরবন এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ একঘেয়েমি ক্লান্ত কর্মময় জীবন ভুলে গিয়ে নিজেকে সজীব করে তুলে। সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণসহ এই সুন্দরবনের সম্পদ প্রাচুর্য এবং জীববৈচিত্র্য আমাদের বিশ্বের দরবারে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। ফলে দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক ও দর্শনার্থী সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আগমন করে থাকেন। সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পর্যটকরা ছোটো ছোটো লঞ্চে করে বিভিন্ন শাখা নদী-খালে ঘুরে বেড়ায়। এতে করে তারা যেমন চারদিকের প্রকৃতির মনোরম রূপ উপভোগ করতে পারে ঠিক তেমনি এর বিচিত্র প্রাণিজগৎও তারা অবলোকন করতে পারে। নদী-খাল দিয়ে ছুটে চলতে চলতে চোখের সামনে ধরা দেয় বিভিন্ন প্রকার পাখি, জলজ প্রাণী ও হরিণের পাল। তবে পর্যটকের অধীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যা খুব কম পর্যটককেই ধরা দেয়। তাইতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অ্যাডভেঞ্চার, ভয় ও শিহরণের এক মেলবন্ধ এই সুন্দরবন। জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ। প্রকৃতির অকৃপণ হাতের সৃষ্টি। সুন্দরবনের করমজল বন্য ও কুমির প্রজনন কেন্দ্র, হারবাড়িয়া ইকো সেন্টার, কটকা, কচিখালী ও নীলকমল অভয়ারণ্য, শেখেরহাট টেম্বপল, কলাগাছিয়া ইকো ট্যুরিজম সেন্টার, মান্দারবাড়িয়া অভয়ারণ্য নামের স্পটগুলো পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত। এসব স্পটে কুমির প্রজনন, অসুস্থ হরিণের পরিচর্যা, হাজার বছরের পুরনো স্থাপনার ধ্বংসাবশেষসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। খুলনা অঞ্চলের বন সংরক্ষক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পর্যটক সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৫৭ জন। এর মধ্যে বিদেশি পর্যটক ছিলেন ২ হাজার ৬২২ জন। রাজস্ব আয় হয়েছে ৩ কোটি ৬১ লাখ ৫ হাজার ৩৮৫ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২ লাখ ১৬ হাজার ১৪৩ জন পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। বিদেশি পর্যটক ছিলেন ২ হাজার ১৪৩ জন। রাজস্ব আয় হয় ৩ কোটি ৯৪ লাখ ৩২ হাজার ৪৮০ টাকা। বর্তমানে ছেটোবড়ো প্রায় ১২০টি ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠান সুন্দরবনে পর্যটকদের ভ্রমণ কাজে নিয়োজিত আছে। এদের রয়েছে আধুনিক সুবিধা সংবলিত জলযান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের বৃক্ষকূলের মধ্যে অন্যতম হলো সুন্দরী বৃক্ষ। এ বনে প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে বলেই এ বনকে সুন্দরবন নামকরণ করা হয়েছে। সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ বন। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য এবং জীববৈচিত্র্য রয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করেই পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। বনের আশপাশে যেসব গ্রাম আছে সেগুলোকে ইকো ট্যুরিজম সেন্টারে পরিণত করতে হবে। যেসব পর্যটক এখানে প্রবেশ করেন তারা যাতে বন্যপ্রাণীর ক্ষতি না করেন, প্লাস্টিক দূষণ না করেন, পরিবেশ সম্পর্কে সতেচন থাকেন, সে ব্যাপারে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক পরিবেশবান্ধব পর্যটনশিল্পের বিপুল সম্ভাবনা আছে। এতে একদিকে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে অন্যদিকে শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। তবে সর্বপ্রথম বনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সুন্দরবন ভ্রমণের নীতিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে পর্যটকদের সুন্দরবন ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কারও কোনো ক্ষতি না হয়।

প্রকৃতির অপরূপ রূপের অপার লীলাভূমি এই সুন্দরবন, যার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। সৌন্দর্য, বনজসম্পদ, কর্মসংস্থান, প্রাণী ও উদ্ভিদ বিচিত্রতা, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের জোগান, বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক অক্সিজেনের জোগান দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা, বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম। এই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবনকে টিকিয়ে রাখতে দস্যুমুক্ত সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আমাদের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই পারে একমাত্র সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখতে।

শহিদুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক

বসন্তের শোভা

আমিনুল ইসলাম সৈকত

বসন্ত নেমে এসেছে ধরায়,
কোকিলের কুহু মন ভরায়।
কত না পুষ্প বনে-কাননে,
রঙিন স্বপন অলির মননে।

কৃষ্ণচূড়ায় রাজপথ সাজে,
দখিনা সমীর কানে বাজে।
বউকথাকও পাখিরা ডাকে,
জোয়ান বুড়ো সুখে হাঁকে।

মৌমাছি দল বেঁধেছে ফুলে,
আগুনরাঙা ঐ পলাশকূলে।
গাছপালায় নবপল্লব জাগে,
সবকিছু যে কী অপূর্ব লাগে।

শিমুল-মহুয়া-পলাশ ঘ্রাণে,
প্রকৃতির হাওয়া লাগে প্রাণে।
রুক্ষতা কেটে যায় ধীরে ধীরে,
ললনা সাজে নানা রং ঘিরে।

ফুলে ফলে প্রাণে শিহরণ,
নব সাজ সবে করে গ্রহণ।
শত প্রয়াসে বসন্ত বরণ,
পথ-প্রান্তে বয় সে সমীরণ।

ফাগুন হাওয়ায়

নকুল শর্ম্মা

আকাশ উতল ফাগুন হাওয়ায়,
আমের মুকুল শাখায় শাখায়।
কোকিল সুখে গান গেয়ে যায়
আজ ফাগুনের প্রথম বেলায়।

পলাশ বনে রঙের মেলায়,
বসন্ত যে ডাক দিলো আয়।
দূরের পাহাড় সবুজ পাতায়,
উঠলো নেচে আলোছায়ায়।

প্রজাপতির পাখায় পাখায়,
ফুলের রেণু আবির মাখায়।
শিমুল বনে আগুন ছড়ায়,
বসন্ত আজ মাটির ধরায়।

ঋতুরাজ বসন্ত

এম. আবু বকর সিদ্দিক

শীতের বুড়ি যাচ্ছে ছাড়ি
হাসছে তরুলতা,
বসুন্ধরায় এলো আবার
নতুন সজীবতা।

শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া
পাপড়ি মেলে হাসে,
দোয়েল পাখি লেজ উঁচিয়ে
নাচে তাদের পাশে।

স্নিগ্ধমাখা দখিন হাওয়া
বইছে ক্ষণে ক্ষণে,
সোনালি রোদ হাসছে যেন
পুলকিত মনে।

কোকিল ডাকে কুহুকুহু
মন মাতানো সুরে,
সুখ বসন্তের শুভাগমন
জানায় ঘুরে ঘুরে।

যার তুলিতে বসুন্ধরা
হরেক রূপে সাজে,
দিবানিশি তার গুণগান
চলুক হৃদয় মাঝে।

রূপের ফাগুন

মাহমুদা দিনা

ফাগুন মাসে আগুন রূপে
ফুটলো নানা ফুল,
কৃষ্ণচূড়া-শিমুল-পলাশ
পাই না খুঁজে তুল!

মিষ্টি সুরে ডাকছে কোকিল
গাছের ডালে বসে,
হঠাৎ হঠাৎ পড়ছে শিমুল
গাছের তলায় খসে।

দুপুরের সঙ্গী দুপুর

ইমরুল ইউসুফ

এই রোদ দুপুরের ক্লান্ত রোদ
এই মায়াময় রোদ
রোদের মায়াবী আঁচলে তুলতুলে মিহি বাতাস
মাছ রাঙার পিঠের মতো কালছে নীল আকাশ
আকাশে হরিণের শিঙের মতো খণ্ড খণ্ড মেঘ
পানকৌড়ির পায়ের পাতার মতো
হেলতে দুলতে আমার পাশে দাঁড়ায়।

আহা রোদ
দুপুরের ক্লান্ত অবিশ্রান্ত রোদ
বসন্তের পাতার মতো মর্মরে রোদ
লজ্জাবতী লতার মতো বিষণ্ন রোদ
এই নির্জন পুকুরের মতো অবসন্ন রোদ
ফুল, পাখি, গাছ, লতাছুঁয়ে, বিরান ভূমি ছুঁয়ে
আমার পাশে দাঁড়ায়
বলে–আমাকে বরণ করো হে মাটি
আমাকে হরণ করো হে আকাশ
আমাকে স্মরণ করো হে মানুষ
কারণ আমিএ কা, বড়ো একা
এই নির্জন দুপুরের সঙ্গী কেবল দুপুর
রোদের সঙ্গী রোদ।

ফিরে দেখি

আলী মামুদ

আজকাল ফিরে দেখি তোমাকে
আগের সাথে মিলাই
দেখি অনেকখানিই বদলে গেছ তুমি
সেই কমলতা আর দেখি না তোমায়
বরং দেখি কিছুটা রুক্ষতা
কিছুটা শুষ্কতা ...।

অথচ আমি তো রয়েছি আমার মতোই
আমি তো রয়েছি আগের মতোই
ভরদুপুরে বেরুই, ফিরি সেই রাতদুপুরে
সেটাতো আমার পেশাগত কারণেও।

আমি তো বদলে যাইনি
বরং কিছুটা বদলেছ তুমিই ...
যা হোক, আবার কি ফিরে আসা
যায় না সেই পুরানো দিনগুলোতে!

রূপের মেলা

মো. তাইফুর রহমান

চারিদিকে রূপের মেলা
দেখে জুড়াই আঁখি
গাছে গাছে মধুর সুরে
ডাকে কতো পাখি।
ফুল বাগানে প্রজাপতি
বসায় দারুণ মেলা
ঘাসের বুকে দুষ্টু ফড়িং
করে অনেক খেলা।
আমার সোনার মাতৃভূমি
খুবই পরিপাটি
আমার দেশের মাটি কিন্তু
সোনার চেয়ে খাঁটি।
দেখতে ভীষণ ভালোলাগে
মিঠা রোদের হাসি
বাংলা আমার জীবনমরণ
বাংলা ভালোবাসি।
মাথার উপর বিশাল আকাশ
মনটা ভীষণ কাড়ে
স্নিগ্ধ বিকেল কাটে আমার
শান্ত নদীর পাড়ে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সংগীতশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার

কাজী মারুফা

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার। ১২ই ডিসেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাপিয়া সারোয়ার কয়েক বছর ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্বামী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। তার বড়ো মেয়ে জারা সারোয়ার বর্তমানে কলেজ অব নিউজার্সিতে জীববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আর ছোটো মেয়ে জিশা সারোয়ার কানাডার অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন নির্বাহী।

পাপিয়া সারোয়ার ১৯৫২ সালের ২১শে নভেম্বর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ছায়ানটে ভর্তি হওয়ার পর তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে গান শিখতে শুরু করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে বেতার ও টেলিভিশনে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে গান গেয়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন।

১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতে স্নাতক ডিগ্রি নিতে ভারতে যান তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনিই প্রথম ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সেখানে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এর আগে তিনি ছায়ানটে ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন ও জাহেদুর রহিমের কাছে গানের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাপিয়ার প্রথম অডিও অ্যালবামটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল 'পাপিয়া সারোয়ার'।

সংগীত ক্যারিয়ারে পাপিয়া সারোয়ার রবীন্দ্রসংগীতের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তার ব্যতিক্রমী কণ্ঠ এবং গায়কির জন্য শ্রোতাদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ স্থান লাভ করেন। আধুনিক গানে তার সাফল্যও ছিল প্রশংসনীয়। 'নাই টেলিফোন নাই রে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম'– গানটি তাকে বাংলা গানের বিশাল শ্রোতা মহলে জনপ্রিয় করে তোলে। এই শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি যদি নিয়মিত আধুনিক গান গাইতেন, তাহলেও সমান জনপ্রিয়তা পেতেন। এরই প্রমাণ তার গাওয়া বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় গান 'নাই রে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম'। তবে এ নিয়ে শিল্পীর মধ্যে কোনো আক্ষেপ ছিল না। গানটি কুসুমকলি চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছিলেন পরিচালক সিবি জামান। এতে ঠোঁট মিলিয়েছেন অভিনেত্রী সুচরিতা। সংগীতবোদ্ধাদের মতে, আধুনিক গান বাছাইয়ে সচেতন থাকার কারণে তার অ্যালবামের সংখ্যা কম ছিল। পাপিয়ার সর্বশেষ অ্যালবাম 'আকাশপানে হাত বাড়ালাম' প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে।

পাপিয়া সারোয়ার ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন এবং ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ পান। ২০২১ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সর্বশেষ এই পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি 'গীতসুধা' নামে একটি গানের দল প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলা সংগীতের জগতে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল। পাপিয়া সারোয়ারের মৃত্যু সংগীতাঙ্গনে একটি অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলা সংগীত ইতিহাসে।

Immortal Ekushey

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

International Mother Language Day

اليوم الدولي للغة الأم

国际母语日

Journée internationale de la langue maternelle

Международный день родного языка

Día Internacional de la Lengua Materna

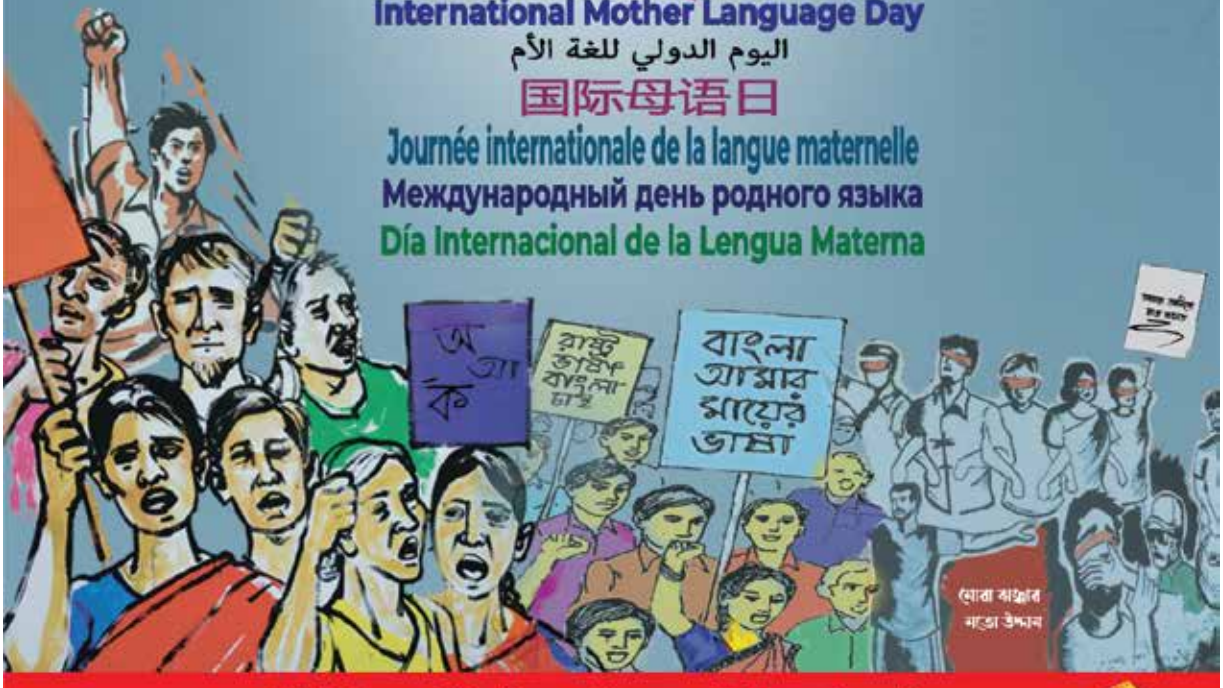

Ministry of Information and Broadcasting
Government of the People's Republic of Bangladesh

DFP

2025

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 08, February 2025, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd